অপরাজিত বসু

স্বাগতম হ্যালির ধূমকেতু

স্বাগতম হ্যালির ধূমকেতু

ডঃ অপরাজিত বসু

ভট্টাচার্য ব্রাদার্স
৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

Swagatam Halleyr Dhumketu

by—

Dr. Aparajita Basu

(A popular Science Collection)

প্রথম প্রকাশ—১৯৮৮

প্রকাশক—ভট্টাচার্য ব্রাদার্সের পক্ষে
সুভাষ ভট্টাচার্য
৩০/১এ কলেজ রো, কলি-৯

মূল্য : ষোল টাকা মাত্র

মুদ্রক : ফাল্গুনী পাল
বাণীমালা প্রেস
৫৬, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় যাঁরা উৎসাহী—

তাঁদের হাতে

সূচী—

লেখকের কথা

জ্যোতির্বিজ্ঞান বয়সে প্রাচীন। বহুকাল আগে থেকে মানুষ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আকাশের সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের খবরাখবর নিয়েছে। অনেক দিনের ব্যাপার হলেও মহাকাশ নিয়ে মানুষের কৌতূহল মেটেনি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান জন্মলাভের পর মহাকাশ মানুষের সামনে নতুন পর্যায়ে বিস্ময়ের পর বিস্ময় তুলে ধরেছে। এ নিয়ে মানুষের কৌতূহল ও কল্পনা আজও ক্রমবর্দ্ধমান। এ বইতে অবশ্য মহাকাশের আধুনিকতম বিস্ময়গুলি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। আমরা মোটামুটিভাবে সৌরজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছি।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই পৃথিবীর আকাশে হ্যালির ধূমকেতুর উদয় হচ্ছে। বর্তমান সংকলনের প্রথম রচনাটি তাই হ্যালির ধূমকেতুকে নিয়ে। সৌরজগতের মধ্যে যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, যেমন সূর্য চন্দ্র বা পৃথিবীর কাছের গ্রহ, তাদের আকাশে চলাফেরা লক্ষ্য করলে এক ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা জ্যোতিষ্করা,— তাদের চালচলনে আছে নানান মজা! সেই মজায় ভরা মহাকাশের বিষয়গুলি সহজ সরলভাবে পাঠকের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছি। সহজ করতে গিয়ে বিজ্ঞান যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। কতটা হয়েছে বা হয়নি সে বিচার করবেন আপনারা, পাঠকেরা।

অপরাজিত বসু

স্বাগতম, হ্যালির ধূমকেতু

১৯৮৫ সাল চলছে। আর মাত্র কয়েক মাস, তারপরই পৃথিবীর আকাশে হাজির হবে হ্যালির ধূমকেতু। দীর্ঘ ছিয়াত্তর বছর পর ভাগ্যবান কিছু মানুষ মহাকাশের উজ্জ্বলতম ধূমকেতুটি দেখতে পাবে। এক জীবনে দু-বার ঐ ধূমকেতুকে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমনকি অনেক মানুষ হ্যালির ধূমকেতু দেখার সুযোগই পায় না। হ্যালির ধূমকেতুকে স্বাগত জানানোর জন্য ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে সাড়া পড়ে গেছে। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্, সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরা উৎসুক হয়ে পড়েছেন। তৈরি হয়েছে হ্যালির ধূমকেতু ক্লাব। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে ধূমকেতুর তথ্য। বিজ্ঞানী মহলে সাজ সাজ রব পড়েছে।

এককালে আকাশে ধূমকেতুর উদয় ভীতির সঞ্চার করত। হঠাৎ কোথা থেকে, কোন্ অন্ধকার থেকে মুক্ত কেশগুচ্ছ মাথায় নিয়ে আকাশে হাজির হত ধূমকেতু। না জানা ছিল তার নাম, না জানা ছিল তার চরিত্র। আমরা ভয় পেতাম। মহামারী, অজন্মা, যুদ্ধের অশুভ সংবাদ বহন করছে ঐ ধূমকেতু—এই বিশ্বাস যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচলিত ছিল।

ধূমকেতু নিয়ে কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন হলেও কৌতূহলীরা সেই প্রাচীনকাল থেকে ধূমকেতু সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। এমন একদিন গেছে যখন মনে করা হত যে ধূমকেতু মহাকাশের বস্তুই নয়, পৃথিবী থেকে কিছু ধোঁয়া উঠে আকাশের পটভূমিতে বিদ্ধ হয়ে আছে। এ যেন বিষ-বাষ্প, মুহূর্তে এর ছোঁয়ায় অমঙ্গল দেখা দেবে। মধ্যযুগে বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর লম্বন (parallax) মাপেন। লম্বনের মাপ থেকে

তাঁরা বললেন যে ধূমকেতু মোটেই কোন ভেসে ওঠা মেঘ নয় বরং ধূমকেতু ঐ মহাকাশের অঙ্গ, নক্ষত্রের সাথী। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূর দিয়ে ধূমকেতু উড়ে যায়।

জ্যোতির্বিদরা রাতের পর রাত জেগে ধূমকেতুদের গতিপথ অনুসন্ধান করে চললেন। কোন নিয়ম নেই—কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর গতিতে অবিশ্বাস্য বক্রপথ ধরে ধূমকেতুদের চালচলন। সত্যি, এ যেন নিয়মের বাইরের বস্তুখণ্ড—কিছু না মানাই তার স্বভাব, বিদ্রোহ তার ধর্ম। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টাইকো ব্রাহে বলেন যে ধূমকেতু বৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়ায় এবং শুক্রগ্রহের কক্ষপথের বাইরের দিকে ধূমকেতুর কক্ষপথ অবস্থিত। টাইকো ব্রাহের ছাত্র জোহান কেপলার পরবর্তীকালে গণনা করে বললেন, ধূমকেতুরা মহাকাশে সরলরেখা ধরে চলাচল করে। এরপর, ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি ধূমকেতুর পরিক্রমাপথের উপর গবেষণা করেন। সদ্য আবিষ্কৃত নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে হ্যালি বললেন যে ধূমকেতুগুলি খুব লম্বাটে ধরনের উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমা করে। ১৫৩১, ১৬০৭, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে যেসব ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছিল তাদের সাদৃশ্য খুব বেশি। হ্যালি বললেন, ঐ ধূমকেতুগুলি আলাদা নয়, একই। ৭৬ বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ ধূমকেতুটি দেখা যাবে। দুঃখের কথা, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের আগেই এডমণ্ড হ্যালি মারা যান এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে যেন মর্যাদা দিতে ১৭৫৮-এর পৃথিবীর আকাশকে উজ্জ্বল করে হাজির হল সেই ধূমকেতু। সবাই হ্যালির নামে জয় জয়কার দিল এবং ধূমকেতুটির নাম হল 'হ্যালির ধূমকেতু'। শেষ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল, আবার আসছে ১৯৮৬-তে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় ১২০০ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে হ্যালির ধূমকেতু আবার পৃথিবীর আকাশে উদিত হচ্ছে। ধূম-

কেতুর পথ বড়ই লম্বা একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্তটির একটি প্রান্ত সূর্যের খুব নিকটে। ঐ পথের সূর্য-নিকট বিন্দুকে অনুস্সূর (perihelion) বলে। হ্যালির ধূমকেতু যখন অনুস্সূর বিন্দুতে তখন তার সূর্য থেকে দূরত্ব মাত্র সাত কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ সূর্য থেকে যতটা কাছে তার চেয়ে অনুস্সূর বিন্দুটি সূর্যের নিকটে। সে সময় ধূমকেতুর পুচ্ছ সব থেকে বড় হয়ে ওঠে, ধূমকেতুর শ্বেতপুচ্ছ মহাকাশে প্রায় দশ কোটি কিলোমিটার ছড়িয়ে পড়ে। আবার ধূমকেতু যখন সূর্যের সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে অর্থাৎ উপবৃত্তের দূরবর্তী প্রান্তে, সেই বিন্দুর নাম অপসূর (aphelion)। হ্যালির ধূমকেতুর অপসূর প্রায় প্লুটোর কাছাকাছি, অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি কিলোমিটার দূরে।

আগেই বলেছি যে ধূমকেতু যখন অনুস্সূর বিন্দুতে অবস্থান করে তখন তার পুচ্ছ সর্বাধিক প্রসারিত হয়। সূর্য থেকে ধূমকেতু যত দূরে যায় ততই তার পুচ্ছ সংকুচিত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত গোটা পুচ্ছটাই মিলিয়ে যায়। পড়ে থাকে গোলাকার ধূমকেতু, শ্বেত ভাস্বর মস্তক (Coma)। হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রভাগ বা মস্তক মোটেই বড় নয়, তার ব্যাস মাইল দশেকের মতো হবে। অবশ্য কোন কোন ধূমকেতুর কেন্দ্র এর থেকে অনেক বড় হয়। মহাকাশের পটভূমিতে দশ মাইলের গোলাকার কোন বস্তুকে খালি চোখে দেখা তো দূরের কথা, দূরবীণেও দেখা সম্ভব নয়। তাই সূর্যের কাছ থেকে ধূমকেতু বেশ কিছুটা সরে গেলে আর আমরা ধূমকেতুকে দেখতে পাই না। সত্যি বলতে কি, যতক্ষণ না কোন ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লম্বা লেজ জন্ম নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধূমকেতু আমাদের নজরেই পড়ে না। এখন প্রশ্ন, সূর্যের কাছে এলে তবেই ধূমকেতুর পুচ্ছ বিকশিত হয় কেন?

ধূমকেতু আদতে একটি ছোট মহাজাগতিক পদার্থ। জমাট বাঁধা বরফ, পাথরের টুকরো, আবদ্ধ গ্যাস (মিথেন ও অ্যামোনিয়া) নিয়ে ধূমকেতু গঠিত। কোথা থেকে এল এরা? একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী

বলেন যে সৌরজগতের দূরতম প্রান্তে ধূমকেতুদের সূতিকাগার আছে। সেখান থেকে যাবতীয় ধূমকেতু সূর্যের টানে রওয়ানা হয়। মজার কথা, ধূমকেতুর উষ্ণতা অস্বাভাবিক বেশি নয়। মাত্র দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মহাকাশে আমরা সাধারণত অত্যন্ত শীতল বা অত্যন্ত উত্তপ্ত বস্তুর দেখা পাই। সে হিসাবে ধূমকেতুর উষ্ণতা আশ্চর্যজনক-ভাবে মধ্যবর্তী। এমন উষ্ণতায় ব্যাকটেরিয়া বা অণুবীক্ষণিক প্রাণীদের বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। সেই হিসাবে, পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের উপর একটি নতুন তত্ত্বের উদয় হয়েছে। সে বিষয়ে পরে আলোচনায় আসছি।

সূর্য থেকে আলোর বন্যা, প্রোটন ও অন্যান্য তড়িতাধানযুক্ত কণাদের স্রোত সব সময় বেরিয়ে আসছে। তার জন্য সূর্যের চারপাশে একটি বিকিরণ চাপ তৈরি হচ্ছে। কোন বস্তু, তা সে উল্কাখণ্ডই হোক বা ধূমকেতুই হোক, তাকে ঐ সূর্যের বিকিরণ চাপকে ঠেলে সূর্যের এলাকায় ঢুকতে হয়। বিরুদ্ধ চাপের ধাক্কায় ধূমকেতুর মূল দেহ থেকে পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে সূর্যের বিপরীত দিকে মুক্ত কেশের মতো বিকশিত হয়। এরই নাম ধূমকেতুর পুচ্ছ। সব সময় তাই দেখা গেছে, ধূমকেতুর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ধূমকেতুর মাথার যে দিকে সূর্য, তার বিপরীত দিকে তার পুচ্ছ জন্ম নিয়েছে। সূর্য থেকে যত দূরে ধূমকেতু চলে যাবে তত তার উপর কম বিকিরণ চাপ পড়বে। বিকিরণ চাপ হ্রাস পাবার দরুন ধূমকেতুর পুচ্ছ হ্রাস হতে হতে শেষ পর্যন্ত এক সময় মিলিয়ে যাবে।

ধূমকেতু যখন মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি এসে পড়বে অর্থাৎ ১৯৮৬-এর জানুয়ারীতে, তখনই, আশাকরি আমরা খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতুটি দেখতে পাবো। এরপর প্রতিদিন তার আকার অর্থাৎ পুচ্ছের আকার বাড়বে এবং ধূমকেতুটি আরো পরিষ্কার করে দেখা যাবে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পর ধূমকেতুটি চলে যাবে। এরপর

আবার দীর্ঘ ছিয়াত্তর বৎসর অপেক্ষা করতে হবে হ্যালির ধূমকেতু দেখার জন্য।

১৯১০ সালে যে হ্যালির ধূমকেতু আমরা দেখেছিলাম, ১৯৮৬ সালের হ্যালির ধূমকেতু তার থেকে সামান্য ছোটই হবে। কারণ, ধূমকেতুটি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার যখন ধূমকেতু সূর্যের কাছে আসে তখন তার পুচ্ছ থেকে কিছু বস্তু গ্যাসের আকারে মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে ধূমকেতুর তনু ক্ষীণকায় হতে হতে শেষে একদিন তা মিলিয়ে যাবে। সেদিন আর কেউ হ্যালির ধূমকেতু দেখতে পাবে না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ধূমকেতু আর ফিরে আসেনি, আবার ফিরে আসবে এমন আশাও নেই।

হ্যালির ধূমকেতু তার আসা যাওয়ার পথে উল্কাধূলি ছড়ায়। ধূমকেতু তার শরীর থেকে গ্যাস, বরফের কুচি,. পাথরের গুড়ো ইত্যাদি যাত্রাপথের চারপাশে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই সব ধূমকেতু ভস্ম আমরা তখনই দেখতে পাবো যখন ধূমকেতুর যাত্রাপথ এবং পৃথিবীর মহাকাশের পরিভ্রমণের পথ পরস্পরকে ছেদ করবে। আমাদের পৃথিবী হ্যালির ধূমকেতুর পথ পার হবে দুবার। আর ঐ দুবারই আমরা উল্কা বর্ষণ (meteor shower) দেখতে পাবো। আকাশ পরিচ্ছন্ন পেলে আকাশ আলো করা ফুলঝুরির মতো উল্কাবর্ষণ দেখা সম্ভব হবে।

ধূমকেতুর মধ্যস্থলের উষ্ণতা বেশি নয়, মাত্র দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সম্প্রতি ইংরাজ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ও প্রবাসী সিংহলী বিজ্ঞানী চন্দ্র বিক্রমসিংহে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্বের আমদানী করেছেন। এঁদের মতে, ব্যাকটেরিয়া শ্রেণীর প্রাণী ঐ ধূমকেতুর দ্বারা বাহিত হয়ে মহাকাশের দূরতম পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। তারপর বিবর্তনের পথ ধরে পৃথিবীতে জটিল প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বটি সমালোচনার বাইরে নয়। কিভাবে বিধ্বংসী মহাজাগতিক কণা এবং ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির আক্রমণ এড়িয়ে ব্যাকটেরিয়া মহাকাশের কোটি কোটি মাইল পাড়ি

দিল তা বোধগম্য নয়।

তবে ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন যোগাযোগ নেই তা নয়। কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত ধূমকেতুর পুচ্ছের শেষ অংশ অনেক সময় পৃথিবীকে ছুঁয়ে যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল তখন তার পুচ্ছের অন্তিমভাগে পৃথিবী ঢুকে পড়েছিল। দৃশ্যত, কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি, কারণ পুচ্ছের ঐ অংশ খুবই পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ। ধূমকেতুর পুচ্ছে হাইড্রোজেন সায়ানাইড ও অন্যান্য দু-একটি বিষাক্ত গ্যাস থাকে। তবে এই গ্যাস এতই কম যে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। অতএব আগত হ্যালির ধূমকেতু থেকে ভয়ের কিছু নেই। ভয় ভাবনার কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা তা করেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

ধূমকেতুর পক্ষে কি পৃথিবীকে আঘাত করা সম্ভব? তাত্ত্বিক বিচারে অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এর আগে বেশ কয়েকবার ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করেছিল। আঘাতের ফলাফল মারাত্মক। প্রবল ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, লাভাস্রোত প্রবাহ, ধূলিময় আকাশ এবং সবার উপরে আঘাতজনিত কারণে বাতাসের উষ্ণতা বাড়বে। এমন মহা আলোড়নে পৃথিবীতে বহু প্রাণী শেষ হয়ে যাবে, অনেক ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন হবে। একদল বিজ্ঞানী বলেন যে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে এমনিভাবে ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপরা হঠাৎ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছিল। যাই হোক, আপাতত আমাদের সেরকম ভয় নেই। তেমনভাবে ধূমকেতু বা উল্কারা যদি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী-মুখো হয়ই তবে নিউক্লিয় অস্ত্র দিয়ে তাদের ঘায়েল করা যাবে, কিছু না হোক, অন্তত তাদের গতিপথ বদলে দেওয়া যাবে।

এরপর প্রশ্ন, ঠিক করে কোথায় ধূমকেতুটি দেখা যাবে। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যাবে। তখনো তার পুচ্ছ তেমন বড়ো থাকবে না। এরপর দিনে দিনে ধূমকেতুর আকার বাড়তে থাকবে। ধূমকেতু যতই সূর্যের কাছে যাবে ততো তার গতিবেগ বাড়বে। তাই ধূমকেতুর পরিবর্তনটা মোটেই

চোখ এড়াবে না। হিসাব কষে দেখা গেছে, ধূমকেতু যখন মঙ্গলগ্রহের কাছে আসবে তখন তার পুচ্ছের উদয় হবে এবং তা আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। ধূমকেতুটি এগারই এপ্রিল ১৯৮৬-তে পৃথিবীর সব থেকে কাছে আসবে। তবে হ্যালির ধূমকেতু যখন অনুসূর বিন্দুতে তখন তাকে সব থেকে বড়ো মনে হবে, যদিও পৃথিবী থেকে সে সময় তাকে দেখার আশা কম। কারণ, সূর্যের খুব নিকটে থাকার জন্য একমাত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ধূমকেতু দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে, অন্য-সময় নয়। যে কারণে বুধগ্রহ দেখার অসুবিধে আছে, সেই একই কারণে অনুসূর বিন্দুতে অবস্থিত হ্যালির ধূমকেতুকে পৃথিবী থেকে দেখা অসুবিধাজনক। সূর্যকে পাক দিয়ে এবার ধূমকেতু ফেরার পথ ধরবে। তখন ধূমকেতুর গতিবেগ খুবই তীব্র হবে, সেকেণ্ডে পঞ্চান্ন কিলোমিটার। ৪ মে, ১৯৮৬-তে ও ২০ অক্টোবর, ১৯৮৬-তে তুবার উল্কাধূলি বর্ষিত হবে।

১৯৮৬ সালের জানুয়ারীতে সূর্যাস্তের কিছু পরে পশ্চিম দিগন্তের কাছে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা যাবে। ধূমকেতুকে প্রায় নক্ষত্র বলে বোধ হবে। এরপর সূর্য ও পৃথিবার যুক্ত রেখার উপর ধূমকেতুটি কয়েকদিন অবস্থান করবে, তখন ধূমকেতু দেখা সম্ভব হবে না। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে সূর্যোদয়ের একঘন্টা আগে পুবের আকাশে ধূমকেতু দেখা যাবে। মার্চ মাসের মধ্যে ধূমকেতুর পুচ্ছ খুব বড়ো হয়ে যাবে, এতো বড়ো হবে যে সমস্ত আকাশের এক ষষ্ঠাংশে তা ছড়িয়ে থাকবে। এগার এপ্রিল লুপাস নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছে ধূমকেতুকে দেখা যাবে। এপ্রিলের শেষে আবার ধূমকেতু পশ্চিম আকাশে, তারপর ধূমকেতু দূরে আরো দূরে চলে যাবে, আমরা আর দেখতে পাবো না।

শেষ যখন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল তখন আমাদের মহাকাশ-বিজ্ঞান আজকের মতো এতো উন্নত ছিল না। সেদিন ধূমকেতু সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর নেওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে মহাকাশ গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছে। তাই নতুন করে ধূমকেতুর উপর গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এরই মধ্যে 'ভেনেরা' নামে একটি মহাকাশ-যান এই উদ্দেশ্যে মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এটি বর্তমানে শুক্রগ্রহের কাছে অবস্থান করছে। ভেনেরা শুক্রগ্রহের উপর অনুসন্ধান চালাবে; তারপর হ্যালির ধূমকেতুর উপর পর্যবেক্ষণ চালাবে। বিজ্ঞানীরা ধূমকেতু সম্পর্কে খুব কৌতূহলী। ধূমকেতুর কেন্দ্রভাগের রাসায়নিক উপাদান কি, সত্যি তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা, ধূমকেতুর পুচ্ছ কি দিয়ে তৈরি, তার গ্যাসীয় চাপ কতো ইত্যাদি নানান তথ্য জানা প্রয়োজন। এ সব জানতে পারলে সৌরজগতের জন্মরহস্যের উপর আলোকপাত করা যাবে।

যাই হোক, আমরা সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি কবে সেই সুদিন আসবে, যেদিন আকাশ উজ্জ্বল করে হ্যালির ধূমকেতু আসবে। জীবনে একবার, মাত্র একবারই ঐ ধূমকেতুটি দেখে জীবন সার্থক বলে মনে হবে। স্বাগতম! সুস্বাগতম হ্যালির ধূমকেতু!

উপগ্রহে প্রাণের সন্ধান

পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও প্রাণ আছে কিনা – এই প্রশ্নটি বেশ পুরানো হলেও এখনও পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যায়নি। এইচ. জি. ওয়েল্ তাঁর 'ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস' বইতে মঙ্গলগ্রহে মানুষের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ভাইকিং' অভিযানের পর মঙ্গলে মানুষ জাতীয় উন্নত প্রাণী তো দূরের কথা, এমন কি নিম্নস্তরের প্রাণের সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আমাদের সব থেকে কাছের শুক্রগ্রহে সোভিয়েট ইউনিয়ন 'ভেনেরা' মহাকাশযান পাঠিয়েছে। ভেনেরার সংবাদঃ শুক্রের ঘন মেঘের মধ্যে উষ্ণতা এত বেশি যে সীসা ধাতুও সেখানে গলে যায়। এমন গরমে যে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না—তা তো ঠিক। মোটকথা, গত এক দশকের মহাকাশ গবেষণা মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনাকে অলীক প্রমাণ করে দিয়েছে।

আমাদের সৌরজগত ছাড়িয়ে দূর নক্ষত্রলোকে যে সব গ্রহ উপগ্রহ আছে, সেখানে প্রাণ আছে কিনা বোঝা শক্ত। প্রথমত, কল্পনাতীত দূরত্বের জন্য মানুষের পক্ষে সশরীরে সেখানে যাওয়া বা মহাকাশযান পাঠানো, বর্তমান প্রযুক্তিস্তরের বিচারে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, মানুষের থেকে উন্নত কোন সভ্যতা যদি সেখানে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে রেডিও তরঙ্গ যোগাযোগ হলেও হতে পারে। তবে এসব সম্ভাবনাগুলি বাস্তবায়িত হবার কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।

খুব কাছের চাঁদ, শুক্র, মঙ্গলে বা খুব দূরের নক্ষত্রজগতে অনুসন্ধান ব্যর্থ হওয়ায় বহির্জীববিজ্ঞানীরা (exobiologist) সৌরজগতের মধ্যাঞ্চলে প্রাণের সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখছেন। সূর্যের বহির্গ্রহগুলি

অর্থাৎ বৃহস্পতি. শনি বা ইউরেনাসে জীবনের বিকাশ অসম্ভব। বৃহস্পতি, শনির দেহের সিংহভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরি, তাদের অত্যাচ্চ চাপ এবং হিমশীতল পরিবেশে প্রাণের কোন আশা নেই। কিন্তু এদের উপগ্রহগুলি কি প্রাণের বিকাশের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী ? এই প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল এ্যারোনটিক্স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন' বা 'নাসা' কর্তৃপক্ষ। 'ভয়জার' মহাকাশযান ছুটি থেকে প্রেরিত তথ্য এসব সন্দেহের মূলে। সন্দেহগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে শনির উপগ্রহ টাইটান ও বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে। ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে ভয়জার-১ টাইটানের পাশ দিয়ে উড়ে গেছে। তখন ভয়জারের টি. ভি. ক্যামেরাগুলি টাইটানের ছবি নেয় এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি টাইটানের উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ু সংগঠন ইত্যাদির উপর পর্যবেক্ষণ চালায়। টাইটান অবশ্য মানুষের কাছে একেবারে অজানা উপগ্রহ নয়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিশ্চিয়ান হাইগিন্স্ টাইটান আবিষ্কার করেছিলেন। টাইটান সব থেকে উজ্জ্বল এবং বড়ো উপগ্রহ। টাইটান আবিষ্কারের অনেকদিন পর ১৯৪৪ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ জিরার্ড কুইপার টাইটানের বায়ুমণ্ডল খুঁজে পান। সমস্ত সৌরজগতে টাইটান একমাত্র উপগ্রহ যার গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস লেগে আছে। কুইপার যে বায়ুমণ্ডল আবিষ্কার করেছিলেন তার মূল উপাদান গ্যাসীয় মিথেন। টাইটানের পরিবেশ পরিমণ্ডল ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সূর্যরশ্মির অতিবেগুনী অংশ মিথেন গ্যাসকে জটিল হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত করে টাইটানের মাটিতে জৈব যৌগের স্তর সঞ্চিত করেছে। বিক্রিয়াজাত মুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে আটক থেকে যায়, কারণ টাইটানের নিম্ন উষ্ণতার জন্য টাইটানের অভিকর্ষ কাটিয়ে তাদের পক্ষে মহাকাশে পালানোর সুযোগ হয় না। টাইটানের আকাশে ভাসে মিথেন গ্যাস, মাঝে মাঝে মিথেনের বৃষ্টি ঝড়ে পড়ে নিচের উদ্বেল মিথেনের সাগরে। মিথেনের সাগরে ইতঃস্তত ভাসমান কঠিন অ্যামোনিয়ার চাঙ —ঠিক যেমন পৃথিবীর সমুদ্রে

ভাসমান হিমশৈল দেখা যায়। ভয়জার-১এর আরো খবর যে টাইটানের গড় উষ্ণতা প্রায় – ১৬৮° সেন্টিগ্রেড। খুব আশ্চর্যের কথা যে, এই – ১৬৮° উষ্ণতাটি মিথেনের ত্রৈধ বিন্দু (triple point)-এর কাছাকাছি। ত্রৈধ বিন্দুর অবস্থায় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থাগুলি একসঙ্গে থাকতে পারে। পৃথিবীতে জলের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, মিথেন সেই সুযোগগুলি টাইটানে পায়।

দূরবীণে টাইটানের দিকে তাকালে তার কমলা রঙ চোখে পড়ে। কেন এই রঙ? ভয়জার-১এর পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা একমত যে টাইটানের মাটিতে জৈব পদার্থের সমারোহ এই রঙের কারণ। জৈব পদার্থের উপর আছড়ে পড়ছে মিথেনের ঢেউ। বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগ্যান গণনা করে বলেছেন যে শনির আকর্ষণে মিথেনের সাগরে তীব্র জোয়ার-ভাঁটা দেখা দেয়। জোয়ারের সময় তরল মিথেন যখন জৈব পদার্থে আছড়ে পড়বে তখন সেখানে সরল প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, ঠিক এইভাবে, সেই আদিম যুগে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার দোলায় পৃথিবীতে সাদাসিধে প্রাণীরা জন্ম নিয়েছিল।

শুধু টাইটান নয়, বৃহস্পতির অন্য একটি উপগ্রহ ইউরোপা সম্পর্কে আমাদের নতুন ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে। ভয়জার-২ খুব কাছ থেকে ইউরোপার অনেকগুলি ছবি নিয়েছিল। ছবিগুলি খুবই ডিটেল, দু-চার কিলোমিটারের মধ্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য তাতে বিধৃত আছে। প্রথমেই মনে হয়, একদা পার্সিভাল লাওয়েল মঙ্গলে যেমন খালের কল্পনা করেছিলেন, তেমনই সোজা সোজা রেখা বরাবর খাল ইউরোপার মাটিতে শুয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা হতচকিত। এগুলি কি? তাহলে কি কোন উন্নত প্রাণী ইউরোপাতে খাল কেটেছে? অবশ্য এখন আমরা জানি যে মঙ্গলগ্রহে ওরকম খাল নেই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে ভূত্বকের পারস্পরিক সরণের জন্য সরলরেখা বরাবর গভীর খাদ বা অত্যুচ্চ পাহাড় তৈরি হতে পারে, যা দূর থেকে খাল মনে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে ইউরোপার পৃষ্ঠদেশ ভীষণ রকম

সমতল। উল্কা-আঘাতের ক্ষত চিহ্ন, যা অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, ইউরোপাতে তা একেবারেই নেই। ইউ-রোপাতে বায়ুমণ্ডলের বিশেষ অস্তিত্ব নেই। সব দিক থেকে ইউরোপা অনন্য। এসব কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে আসলে ইউরোপার পিঠ বরফ দিয়ে ঢাকা। বরফের নিচে আছে সমুদ্র, জলের সমুদ্র। সেই সমুদ্রে কোন প্রাণী আছে কি নেই তা জোর করে বলা যায় না।

এখনও পর্যন্ত আমাদের যা সংবাদ, গোটা সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ও টাইটানে তরল পদার্থ আছে এবং ইউরোপাও এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত হতে পারে। প্রাণের বিকাশের জন্য যে তরল পদার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই পৃথিবীর পরই প্রাণের সম্ভাবনা আছে টাইটানে ও ইউরোপাতে। কিন্তু এই সন্দেহ দূর করতে বা ঠিক ঠিক অবস্থা জানতে টাইটান ও ইউরোপাতে আরো অভিযান প্রয়োজন। দুঃখের কথা, আমেরিকার প্রস্তাবিত মহাকাশযান, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্যালিলিও' এবং যে বৃহস্পতিতে অভিযান করবে বলে ঠিক ছিল, তা অর্থের অভাবে বাতিল হতে চলেছে। এদিকে 'নক্ষত্র যুদ্ধের' প্রয়োজনে তাদের অর্থের অভাব হচ্ছে না। মহাকাশ গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ যে শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটায় তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে তার একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকে —একথা রাষ্ট্রনায়কদের মনে রাখা উচিত। আমরা আশা করবো, অচিরে টাইটান-ইউরোপার রহস্য উন্মোচিত হবে।

নিরাপত্তার ঘেরাটোপ

মহাকাশ বড়ো বিপদের জায়গা। মারমুখী উল্কা, তড়িতাহত কণা, তীক্ষ্ণ রশ্মি যে কোন প্রাণীকে মুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। দেহকোষের কলকব্জা অকেজো করতে এদের জুড়ি নেই।

পৃথিবীর পিঠে আমরা চলে ফিরে বেড়াই। মাথার উপর তো তেমন ছাদ নেই। তবু আমরা নিরাপদ, মহাকাশের বিপদ আমাদের স্পর্শও করে না। নিরাপত্তার ঘেরাটোপের তলায় আমাদের বাস।

নিরাপত্তা বলতে প্রথমে বাতাসের কথা মনে আসে। বায়ুমণ্ডল ছোট ছোট উল্কাকে পুড়িয়ে দেয়। নচেৎ এই ঢিলগুলিই আমাদের শেষ করে দিত। উঁচু আকাশে ছড়িয়ে আছে ওজোন গ্যাস। তারা, আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে। আরো উঁচুতে ছুটে বেড়াচ্ছে মহাজাগতিক কণিকারা, এক্স-রশ্মি, তড়িতবাহী অনু-পরমাণু। তাদেরও বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা আছে। আছে ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের বেড়াজাল। সে মায়াজাল হাজার হাজার কিলো-মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার, তার জন্মরহস্য লুকিয়ে আছে পৃথিবীর মাটিতে। কি রকম?

আমাদের পৃথিবী আদতে একটি চুম্বক। সেই যে, বহুযুগ আগে মধ্য এশিয়ায় যখন 'লোডস্টোন' পাথরের আবিষ্কার হয়েছিল, যে পাথরকে ঝুলিয়ে রাখলে নিজে নিজে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দিকনির্দেশ করে রাখে, তারপর থেকে আমরা চুম্বক ব্যবহার করে আসছি। পৃথিবী নিজে একটা চুম্বক বলে কম্পাসের কাঁটা উত্তর-মুখো হয়ে থাকে। পৃথিবী-চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু কিন্তু পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত নয়। ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে হাজার

মাইল দূরে কানাডার প্রান্তে চুম্বক-উত্তর মেরু এবং ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে আণ্টারটিকার রস সাগরের প্রান্তে চুম্বক-দক্ষিণ মেরুর অবস্থান। দুই চুম্বক মেরু যোগাযোগকারী যে রেখা, যার নাম অক্ষ রেখা, তাও পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করে যায় না, একটু পাশ দিয়ে তার গমন। তারপর, পৃথিবীর চুম্বক ক্ষমতাও কালের হাতে ক্ষয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে একদিন তা শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে। ভূতাত্ত্বিকেরা জানাচ্ছেন যে এর আগে বেশ কয়েকবার পৃথিবীর চুম্বক-মেরু দিক বদল করেছে—আজ যা উত্তর মেরু, এককালে তা দক্ষিণ মেরু ছিল। এক কথায়, পৃথিবী সদৃশ চুম্বকের নানান ব্যতিক্রম আছে, আছে একেবারে নিজস্ব চরিত্র।

চুম্বক মাত্রই প্রভাবশীল। চুম্বক তার কাছাকাছি লোহা বা ঐ ধরনের পদার্থকে আকর্ষণের বাঁধনে বেঁধে রাখে। চুম্বক থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, তত ঐ প্রভাব কমবে। কাগজে কলমে চুম্বকের প্রভাব অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু বাস্তবে তেমন নয়; চুম্বক থেকে বেশ কিছুটা দূরে গেলে আর চুম্বকের টান অনুভূত হয় না। চুম্বকের আশেপাশে যতটা জায়গা জুড়ে এই টান বিস্তৃত, তাকে চুম্বকের 'ক্ষেত্র' বলে। এই ক্ষেত্রতলে ছড়ানো আছে গুচ্ছ গুচ্ছ অদৃশ্য চুম্বক-বলরেখা। বলরেখার উপর একটি ক্ষুদ্র কম্পাস রাখলে, কম্পাসের মেরুদুটি ঐ রেখার উপর অবস্থান করবে।

স্বভাবতই, পৃথিবীরূপী চুম্বকের চারধারে বলরেখা টানা আছে। এক-একটি বলরেখা উত্তর মেরু থেকে বেরিয়ে মহাকাশ পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুতে শেষ হয়। যেন রেখার খাঁচায় বন্দী পৃথিবী।

আর বন্দী বলেই আমরা বেঁচে গেছি। বলরেখার গণ্ডী পেরিয়ে মহাকাশের তড়িতাহত কণারা পৃথিবীতে আসতে পারে না। চুম্বক-বলরেখার এমনই বৈশিষ্ট্য যে অন্য কোন চুম্বক বা তড়িতাধান প্রাপ্ত বস্তুকণা এগিয়ে এলেই ঐ বলরেখায় জড়িয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বললেন, মহাকাশের তড়িত কণারা বলরেখায় বাধাপ্রাপ্ত হতে

বাধ্য। চুম্বকত্ব ও তড়িত একই রকমের শক্তি, পরস্পর রূপান্তর-যোগ্য। চুম্বক যেমন তড়িত উৎপন্ন করতে পারে, তেমনি তড়িতও চুম্বকের জন্মদাতা হতে পারে। গতিশীল তড়িতকণারা, যারা প্রকারান্তরে চুম্বকত্ব বহন করছে, তারা চুম্বক বলরেখা বরাবর বাঁধা পড়তে বাধ্য। পৃথিবীকে ঘিরে ফেলা চুম্বক-বলরেখা তাই মহাকাশের আগন্তুক তড়িতাহত কণাদের আটকে দিয়ে একটি বন্ধনজাল তৈরি করেছে—এই বন্ধনীজালের নাম 'ম্যাগনেটোস্ফিয়ার'।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন জেমস ভ্যান অ্যালেন। তাঁর নামে প্রথম দিকে একে বলা হতো 'ভ্যান অ্যালেন বিকীরণ বলয়'। এই বিকীরণ বলয় পৃথিবীর চারদিকে সুষমভাবে বিন্যস্ত নেই। দিনে ও রাতে বলয়ের বিস্তার-পরিধির পরিবর্তন হয়। যেমন, দিনের বেলায় যে বলয়ের অবস্থিতি পৃথিবীর কেন্দ্র হতে চল্লিশ হাজার মাইল দূরে, রাতে তাই বেড়ে হয় লক্ষাধিক মাইল। সূর্যের সঙ্গে এর খুব নিকট সম্পর্ক আছে।

সূর্য থেকে সৌরকণার স্রোত পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। এই কণারা তড়িতাধান বয়ে আনে। একে অনেকে 'সৌরবায়ু' বলেন। সৌরবায়ু বহুদূর, এমনকি পৃথিবী ছাড়িয়ে আরো দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সৌরবায়ুর প্রবাহে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রসারিত হয়।

সৌরবায়ুর মধ্যে তড়িত কণিকারা, প্রোটন কণারা থাকে। যখন সূর্যের বুকে সৌরকলঙ্কের ঘনঘটা বাড়ে তখন সৌরবায়ুর তড়িত কণিকাদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। সৌরকলঙ্কের গভীর ক্ষত থেকে ঝলকে ঝলকে ঐ প্রোটন কণারা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে, সূর্যের কিরীট (যাকে সূর্যগ্রহণের সময় ভালোভাবে দেখা যায়) যখন পৃথিবীমুখো হয় তখন ঐ কণিকারা পৃথিবীর দিকে বেশি বেশি করে ছুটে আসে। তার ফল ?

সৌরকণিকারা ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে জোরে ধাক্কা দেয়, তাকে আন্দোলিত করে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অরোরা দ্যুতির ঘনঘটা

বেড়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি, যে পৃথিবীর চুম্বক-বলরেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে বেরিয়ে মহাকাশ ঘুরে দক্ষিণ মেরুতে এসে শেষ হয়। তার মানে, দুই মেরু থেকে বলরেখাগুলি সটান উপরে উঠে গেছে। সৌরকণিকারা, প্রোটন কণারা এই বলরেখা বরাবর তড়িতাধান ত্যাগ করতে করতে পৃথিবীতে নেমে আসে। তারা মেরুর আকাশে আলোর আভা ছড়ায়, এর নাম 'অরোরা' বা মেরুপ্রভা। অপূর্ব এই দৃশ্য। তুন্দ্রার দেশে যাঁরা একবার এই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেছেন তাঁরা এর রূপ ভুলতে পারেন না।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার আন্দোলিত হলে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের অদল-বদল হয়, রেডিও ব্যবস্থায় উৎপাত দেখা দেয়। ম্যাগনেটোস্ফিয়ার যে সত্যি সত্যিই শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকাদের বেঁধে ফেলে তার প্রমাণ হিসেবে একবার একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে আমেরিকানরা তিনটি পারমাণবিক বোমা মহাকাশে ফাটায়। বোমা থেকে যতো তড়িত কণিকারা বেরিয়েছিল, যাদের মারণ-ক্ষমতা প্রশ্নাতীত, তারা সবাই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের জালে আটকে পড়েছিল। ঐ সময় ম্যাগনেটোস্ফিয়ার কিছুটা আন্দোলিত হয় এবং মেরুর আকাশে দুর্বল মেরুজ্যোতিও চোখে পড়েছিল। পরবর্তীকালে, কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বরাবর ঐ তড়িত কণিকাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তারা দীর্ঘকাল বহাল তবিয়তে ঐ স্থানে আটকে ছিল, পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার ক্ষমতা ছিল না।

যাই হোক, এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার একটি প্রকৃতিদত্ত রক্ষাকবচ। ঘেরাটোপের আড়ালে আমরা দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। কখনও কোন অবস্থাতেই এই প্রকৃতিজাত ছত্রছায়ার ক্ষতি না হয়, তাই আজ দেখতে হবে।

গ্রহরা হেলে আছে

গ্যালিলিও তখন সবে টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন। এমন আজব নলের কথা এর আগে কেউ শোনেনি। জনৈক হল্যাণ্ড নিবাসী চশমার কাচ নির্মাতা একবার ঘোষণা করেছিলেন যে একটি নলের দু'পাশে দুটি উত্তল কাচ বসিয়ে তার মধ্য দিয়ে তাকালে দূরের জিনিসকে কাছে দেখায়। তাই শুনে, গ্যালিলিও বুদ্ধি খরচ করে সেই আদ্যিকালের দূরবীণ তৈরি করেছিলেন। তারপর সেই দূরবীণ আকাশমুখো করে যা যা দেখলেন তা সেকালে ভাবাই যেত না। গ্যালিলিও শুক্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি, বৃহস্পতির উপগ্রহ এবং আরো অনেক কিছু দেখেছিলেন। তবে এদের মধ্যে একটিই তাঁকে সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিল—তা শনির উপগ্রহ। কি রকম?

সেকেলে দূরবীণে গ্যালিলিও শনির দু'পাশে দুটি উপগ্রহ দেখেছিলেন। আবছা, গোল গোল—প্রায় একই মাপের দুটি উপগ্রহ শনির দু'দিকে অবস্থিত। তৃপ্ত মনে গ্যালিলিও তাঁর উপগ্রহ দর্শনের কথা সবার কাছে বলে বেড়ালেন। এর কয়েক বছর পর গ্যালিলিও আবার শনির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু কই সেই উপগ্রহ দুটি? কোথাও নেই, একেবারে ভ্যানিস! গ্যালিলিও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন। গভীর বিতৃষ্ণায় গ্যালিলিও বলে ফেললেন, —'একি, শনি তার বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেললো!' শনির রোষ নিয়ে গল্পকথা এদেশে ওদেশে—সব জায়গায় বহুদিন থেকে প্রচলিত। সেই যে গ্যালিলিও শনির উপর রেগে গেলেন, তারপর যতদিন বেঁচেছিলেন, শনির দিকে ভুলেও তাকাননি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? শনি তো আর সত্যি সত্যিই তার উপগ্রহদের

খেতে পারে না। তাহলে ? সবটাই গ্যালিলিওর দৃষ্টিভ্রম নয় তো ? না, পুরোপুরি দৃষ্টিভ্রম নয়। আসলে গ্যালিলিও শনির বলয়টি দেখেছিলেন। সেকেলে দূরবীণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। বুঝিয়ে বলি।

সৌরজগতে অনেকগুলি অবাক করে দেবার মতো জিনিস আছে। যেমন গ্রহদের পরিক্রমা-তল। সূর্য এবং সব গ্রহ কমবেশি একটি সমতলে অবস্থিত। একটা বড়ো চওড়া কাগজের মাঝে যেন সূর্য বসানো, কিছু দূরে দূরে ঐ কাগজের উপর গ্রহগুলি বসানো আছে। কাগজের-তল বরাবর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সূর্য ও গ্রহগুলিকে একই সঙ্গে দেখা যাবে।

আর পাঁচটা গ্রহর মতো শনিও একটি কাল্পনিক অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, তার জন্য দিন হচ্ছে রাত হচ্ছে। আর এই অক্ষরেখাটি শনির উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে গেছে। মজার কথা, শনির অক্ষরেখা তার পরিক্রমা-তলের উপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে নেই, হেলে আছে— প্রায় ২৭° কোণে হেলে আছে (যেমন আমাদের পৃথিবী ২৩½° হেলে আছে)। সবাই জানে যে শনির চারদিকে বলয় আছে। চ্যাপ্টা মতো দেখতে এই বলয়টি শনির গায়ে লেগে নেই, একটু দূর দিয়ে চাকার মতো ঘুরছে। বলয় যতটা চওড়া ততটা পুরু নয়। তাই দূর থেকে বলয়ের চওড়া-তলটাই চোখে পড়ে—জিনিসটা অনেকটা রাজা রামমোহন রায়ের টুপির কানাতের মতো।

শনির বলয়ের চওড়া-তল তার নিরক্ষরেখার-তলে অবস্থিত। অর্থাৎ, শনির চারদিকে বেড় দেওয়া নিরক্ষরেখা যে তলে আছে, সেই তল বরাবর শনির বলয়ও আছে। ফলে, শনির বলয় নিজেই শনির পরিক্রমা-তলের সঙ্গে ২৭° কোণ করে হেলে থাকবে। সহজ জ্যামিতি —শনির অক্ষ ২৭° কোণ করে পরিক্রমা-তলে দাঁড়িয়ে আছে, অক্ষ আবার নিরক্ষরেখা-তলে লম্ব, তাই নিরক্ষরেখা-তল বা বলয়ের-তল ঐ পরিক্রমা-তলের সঙ্গে ২৭° কোণ করে আছে।

শনি এবং পৃথিবী দুই-ই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ফলে শনি

কখনও পৃথিবীর সামনে, কখনও পৃথিবীর পিছনে,কখনও এ-পাশে কখনও ও-পাশে চলে যাচ্ছে। এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে শনির বলয়কে ভিন্ন ভিন্ন দেখাবে , কখনও চ্যাপ্টা থালার মতো, কখনও একটি রেখার মতো। কি ভাবে ?

একটা উদাহরণ দিই। একটা মাঠের মাঝখানে চারটি খুঁটি পুঁতে তার উপর একটা টিনের চালা বাঁধা হয়েছে। সামনের খুঁটি দুটো ছোট, পেছনের খুঁটি দুটো বড়, তাই চালাটা হেলানো, একদিকে ঝুঁকে আছে। এখন এমন একটা চালাঘরের সামনের দিকে দূরে দাঁড়ালে চালের উপরটা পুরো দেখা যাবে, পিছনে দাঁড়ালে টিনের নিচটা দেখা যাবে, আর পাশে দাঁড়ালে টিনের উপর বা নিচ দেখবো না—দেখবো টিনের পার্শ্বরেখা।

শনির বলয়কে দেখার ব্যাপারটা অনেকটা ঐ রকম। পৃথিবী ও শনির একটা বিশেষ অবস্থানে শনির বলয়ের উপরিভাগ পৃথিবী থেকে দেখা যায়, শনি যখন উল্টোদিকে যায় তখন বলয়ের তলদেশ দেখা যায়, কিন্তু পৃথিবীর বাকি দুই পাশে শনি এলে বলয়টা আর দেখা যায় না, শুধু বলয়ের ক্ষীণ পার্শ্বরেখা তখন পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান।

শনি গ্রহ সূর্যকে ২৯ বছরে একবার পরিক্রমা করে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে আজ যদি পৃথিবী থেকে শনির বলয়ের উপরের অংশ আমরা দেখতে পাই, তাহলে আবার প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর পর শনির বলয়ের নিম্নতল দেখতে পাবো। আজ থেকে প্রায় সাত বছর বা একুশ বছর পর, শনি যখন পৃথিবীর দু'পাশে আসবে, তখন শনির বলয়ের তলদেশগুলি চোখে পড়বে না, চোখে পড়বে শুধু বলয়ের পার্শ্বরেখা। গ্যালিলিওর দুর্বল দূরবীণে বলয়ের সম্পূর্ণরূপ ধরা পড়েনি, গ্রহের দু'পাশে বলয়ের চ্যাপ্টা দুই অংশকে মনে হয়েছিল দুই উপগ্রহ। বছর সাতেক পর তিনি যখন আবার শনিকে দেখেন ততদিনে শনি পৃথিবীর একপাশে সরে গেছে, তাই বলয়কে তিনি আর দেখেননি ; অমন সাদামাটা দূরবীণে বলয়ের ক্ষীণ পার্শ্বরেখা তাঁর চোখেই পড়েনি।

গ্যালিলিও যে শনিকে দোষারোপ করেছিলেন তার জন্য শনি দায়ী নয়, তিনিও নন। সব কিছুর মূলে দূরবীণের অক্ষমতা এবং শনির হেলে থাকা অবস্থা। শুধু শনি কেন, অন্যসব গ্রহর অক্ষরেখা, পরিক্রমা-তলের লম্বরেখার থেকে কম বেশি হেলে আছে। বুধ প্রায় ১০°, পৃথিবী ২৩½°, মঙ্গল ২৫°, বৃহস্পতি ৪°, নেপচুন ২৯° কোণ করে তাদের পরিক্রমা-তলে হেলে আছে। তবে, এ ব্যাপারে সবচেয়ে টেক্কা দিয়েছে শুক্র এবং ইউরেনাস। শুক্রর অক্ষরেখা, ঐ লম্বরেখার সঙ্গে প্রায় ১৮০° কোণ করে আছে অর্থাৎ শুক্র, পৃথিবী যে দিকে ঘুরছে, তার বিপরীত দিকে বা ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে আবর্তিত হচ্ছে। আর ইউরেনাস? তার অবস্থা আরো কাহিল! সে ঐ লম্বর সঙ্গে প্রায় ৯৮° কোণ করে আছে, মানে তার অক্ষরেখা পরিক্রমা-তলের উপর প্রায় শুয়ে আছে।

কেন এমন পার্থক্য? এখনও কেউ জানে না। এ খবর সেদিন জানা যাবে যখন আমরা সৌরজগতের জন্ম-রহস্য জানতে পারবো।

সূর্য উঠলো পশ্চিমে

কোথায় পশ্চিমে সূর্যোদয় হয়? শুধু পশ্চিমে সূর্যোদয় নয়, সেখানে প্রায় তু-মাস দিন, তু-মাস রাত ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত নেই ; বাদামী রঙের বাতাসে আকাশ ছেয়ে আছে। উত্তর—কোথাও এরকম হতেই পারে না, একমাত্র কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী ছাড়া।

কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি কোন কল্পবিজ্ঞান লিখতে বসিনি। যা বলেছি, তা সত্যি ; একেবারে ঘরের তুয়ারে তা ঘটছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের যে গ্রহ, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ, তার মাটিতে এমন সব আজব ঘটনা ঘটে। কিছুদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন সেখানে তুটি মহাকাশযান (ভেনেরা-১৩ ও ভেনেরা-১৪) নামিয়েছিল। তারা যা সংবাদ পাঠিয়েছে, তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নাটকীয়। যেমন শুক্রগ্রহে মেঘ ছেয়ে আছে। এই মেঘ এতই ঘন যে পৃথিবী থেকে আমরা শুক্রের পিঠ দেখতে পাই না। এ কিন্তু কোন জলবাষ্পের মেঘ নয়, যে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে শুক্রকে সুজলা-সুফলা করে তুলবে। শুক্রের আকাশে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মেঘ। অন্য তু-চারটে গ্যাস থাকলেও তা নেহাৎই ছিটেফোঁটা। কার্বন ডাই-অক্সাইড মেঘের ঘন আবরণ যেমন আমাদের দৃষ্টিপথকে আটকে দেয়, তেমনি শুক্রগ্রহের উত্তাপকে বেরিয়ে আসতে দেয় না। ফলে যা হবার তাই হয়। শুক্রগ্রহ গরম, ভীষণ গরম। গ্রহটা এতই গরম যে মহাকাশযানের দামী যন্ত্রপাতি কিছুক্ষণ কাজ করার পর জ্বলে-পুড়ে গেল। ভেনেরা মহাকাশযান আরো সংবাদ পাঠিয়েছে যে শুক্রের আকাশে বাদামী ধোঁয়ার ছড়াছড়ি। সেখানে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় ওঠে। তখন সেটা দেখার মতো হয়। ঘন বাদামী

মেঘ একদিক থেকে অন্যদিকে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলে। অবশ্য ঐটুকুই, কোন শুকনো পাতা ওড়া বা ঝম ঝম করে বৃষ্টি—এসব আর হয় না।

এ সমস্ত খবর নতুন টাট্‌কা হলেও শুক্র নিয়ে আরো অনেক মজাদার সংবাদ বহুদিন আগে থেকেই আমরা জানি। প্রাচীনকালে, যখন আকাশ নিয়ে মানুষ প্রথম ভাবতে সুরু করে, তখন সূর্য, চাঁদের পরে যার উপর মানুষের নজর পড়েছিল, তা হলো এই শুক্রগ্রহ। এর কারণ, শুক্র আকাশের তৃতীয় উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে বা শেষ রাতে পূর্ব দিগন্তে শুক্র জ্বল জ্বল করে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন কি তাকে মানুষ না দেখে পারে? শুক্রকে নিয়ে মানুষ কত কি-ই না ভেবেছে। ভারতবর্ষ বাদে আর সব প্রাচীন সভ্যতায় শুক্রকে রহস্যময়ী দেবীর সঙ্গে তুলনা করেছে। হিন্দু পুরাণে শুক্রকে দৈত্যগুরু বলা হয়। ব্যবিলনীয়রা শুক্রগ্রহকে মনে করতো 'ঈস্টার', যার আশীর্বাদে পৃথিবী সুজলা-সুফলা হয়।

অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ তো বুঝতেই পারেনি যে শুকতারা ও সাঁঝের তারা—একই গ্রহ। শুকতারা যখন আকাশে থাকে তখন সন্ধ্যাতারা দেখা যায় না। আবার বছরের যে সময় সন্ধ্যাতারা পশ্চিম আকাশে থাকে তখন পুব আকাশে শুকতারার হদিশ নেই। কেন এমন হয় সে বিষয়ে পরে আলোচনায় আসছি।

প্রাচীন বিজ্ঞানীরা আর একটা জিনিস দেখেছিলেন—শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা পুবে উঠে মাঝ আকাশ পার হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায় না। তাঁরা দেখলেন, শুকতারা সূর্য ওঠার কয়েক ঘণ্টা আগে পূব আকাশে ওঠে, তারপর সূর্য উঠলে তার জ্বলজ্বলে ভাবটা সূর্যের আলোয় কমে কমে শেষকালে আকাশে হারিয়ে যায়। তবে, সঠিক অবস্থানটা আগে থেকে জানা থাকলে দিনের বেলাতেও শুকতারাকে আকাশে দেখা সম্ভব। আবার তেমনি, সূর্য ডোবার সময় সময় সাঁঝের তারা পশ্চিম আকাশে ফুটে ওঠে। তার কয়েক ঘণ্টা পর পশ্চিমে সেই তারা ডুব দেয়।

কখনও শুক্রগ্রহকে আমরা মাঝরাতে মাথার উপরে দেখতে পাই না। এর কারণ কি ?

পৃথিবীতে যেখানে মাঝ রাত তখন সূর্য ঠিক তার বিপরীত দিকে থাকে। এর অর্থ হলো, কলকাতায় যখন রাত বারোটা, তখন কলকাতার বিপরীতে উত্তর আমেরিকার আকাশে সূর্য মাঝ মাথায়। তাহলে, কলকাতার রাত বারোটায় মধ্য আকাশে যদি শুক্রগ্রহকে দেখা দিতে হয়, তবে পৃথিবীর একদিকে সূর্য অন্যদিকে শুক্রগ্রহ এসে পড়ে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সূর্য থেকে শুক্রগ্রহের দূরত্ব কম, পৃথিবীর দূরত্ব বেশী। তাই শুক্র সব সময় তার যাত্রাপথের বহির্ভাগে পৃথিবীকে রেখে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। এই ব্যবস্থায়, একটি সরলরেখার উপর সূর্য, পৃথিবী, শুক্রকে সাজাতে হলে দুটি উপায় আছে। এক, সূর্যকে মাঝে রেখে একদিকে পৃথিবী অন্যদিকে শুক্র। দুই, শুক্রকে মাঝে রেখে একদিকে পৃথিবী অন্যদিকে সূর্য। সমস্ত বিষয়টি চাঁদের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা করলে আরো ভালো বোঝা যাবে। আমরা জানি, অমাবস্যার সময় চাঁদের একদিকে সূর্য, অন্যদিকে পৃথিবী থাকে। সে সময় এরা যদি এক সরলরেখার উপর চলে আসে, তাহলে চাঁদ সূর্যের আলোর পথকে আটকে দিয়ে সূর্যগ্রহণ ঘটায়। অমাবস্যার মতো, শুক্রগ্রহ মাঝে মাঝে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এক রেখায় এসে অন্য রকমের এক 'সূর্যগ্রহণ' (transit) সৃষ্টি করে। আকাশে সূর্যের তুলনায় শুক্রগ্রহটি খুব ছোট। সেজন্য এই 'গ্রহণে' সূর্যের উজ্জ্বল থালার উপর দিয়ে ছোট কালো একটি বিন্দুকে একদিক থেকে অন্যদিকে সরে যেতে দেখা যায়। এই 'সূর্যগ্রহণ' পৃথিবী থেকে অনেক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন। বেশ কয়েক বছর পর পর এমন ঘটনা ঘটে।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে শুক্র সম্পর্কে একটি সংবাদ ছিল। সাম্প্রতিক একটি দিন শুকতারাকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখা গেছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল ? তার মানে শুক্রের আলো প্রতিফলনের মাত্রা সবদিন সমান নয় ? ঠিক তাই। চাঁদের কলা বৃদ্ধির মতো শুক্রেরও কলা বৃদ্ধি

দেখা যায়। খালি চোখে তা বোঝা না গেলেও দূরবীণে বেশ ধরা পড়ে। গ্যালিলিও প্রথম ১৬১০ খৃষ্টাব্দে শুকতারার কলা পরিবর্তন আবিষ্কার করেছিলেন। সত্ত তৈরি দূরবীণ দিয়ে শুক্রগ্রহ দেখার পর গ্যালিলিও জোহান কেপলারকে লিখেছিলেন, 'ভালবাসার দেবী চাঁদের মতো কলা পরিবর্তন করে।' সেকালে গুপ্ত শব্দের সাহায্যে বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশ করার রেওয়াজ ছিল। 'ভালবাসার দেবী' মানে শুক্র।

তবে গ্যালিলিওর অনেক আগে শুক্রগ্রহের স্থান পরিবর্তন ও তার মাপজোক করা হয়েছিল। ব্যাবিলনীয়রা যীশুর জন্মের দু-শ' বছর আগে এসব লিপিবদ্ধ করে গেছে। খৃষ্টপূর্ব ১৭০-এ ব্যাবিলনের সম্রাট আম্মিজাডুগার নির্দেশে জ্যোতির্বিদরা শুক্রকে পর্যবেক্ষণ করে-ছিলেন। ব্যাবিলনীয়দের হিসাব অনুযায়ী, শুকতারা ও সূর্যের উদয়ের মাঝখানে তিন ঘণ্টা আট মিনিটের বেশী সময়ের পার্থক্য থাকে না। আবার, সূর্য অস্ত যাওয়ার তিন ঘণ্টা আট মিনিটের মধ্যে সন্ধ্যাতারা অস্ত যায়। কখনও এই সময় অতিক্রান্ত হয় না।

কোথা থেকে এই হিসাব এল তা বলি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ। তারপরের গ্রহ শুক্র, সূর্যকে প্রায় গোলাকার পথে ২২৪.৭ দিনে (এখানে একদিন বলতে চব্বিশ ঘণ্টা বোঝায়) একবার ঘুরে আসে। শুক্রের পরবর্তী গ্রহ পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫.২৬ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর পরে আছে মঙ্গল, তারপর বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি। শুক্র ও পৃথিবী— দুটি গ্রহর বার্ষিক গতির দিক হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। শুক্র ও পৃথিবী প্রায় একই তলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে অর্থাৎ ২৫.৮ কোটি কিলোমিটার দূরে থাকে তখন তাকে 'সর্বোচ্চ অবস্থান' বলে। 'সর্বোচ্চ অবস্থানে' পৃথিবী থেকে শুক্রের পুরো গোল চেহারাটা দেখতে পাওয়ার কথা (পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়)। কিন্তু দুটি কারণে এই দেখার

সৌভাগ্য থেকে আমরা মাঝে মাঝে বঞ্চিত হই। প্রথমত, এই সময় পৃথিবী ও শুক্রের দূরত্ব সবচেয়ে বেশী বলে শুক্রকে খুব ছোট দেখায়। দ্বিতীয়ত, সূর্য ও শুক্র একদিকে থাকায় সূর্যের উজ্জ্বল আলো শুক্রকে দেখতে বাধা দেয়। তাহলেও এটা মানতে হবে যে একমাত্র 'সর্বোচ্চ অবস্থানে' শুক্রগ্রহ তার মুখ সম্পূর্ণভাবে আমাদের দিকে ফিরিয়ে ধরে। 'সর্বোচ্চ অবস্থানের' শুক্র ও সূর্যদেব প্রায় একসময়ে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় ও পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়।

এরপর শুক্র দ্রুতবেগে কক্ষপথে ছুটতে থাকে। সে তুলনায় পৃথিবীর গতি মন্থর। দিনে দিনে শুক্র-পৃথিবীর রেখা ও পৃথিবী-সূর্যের রেখার মাঝের কোণ বাড়তে থাকে। এর ফলে, প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বেশি বেশি দেরী করে সন্ধ্যাতারা অস্ত যায়। আর পৃথিবী ও শুক্রের দূরত্ব কমার দরুণ শুক্রের আকার আস্তে আস্তে বাড়ে। এর পর একসময় শুক্র-পৃথিবীর রেখা ও পৃথিবী-সূর্যের রেখার মাঝের কোণ সবচেয়ে বেশি হয়। এইকোণের মান ৪৭°। এই অবস্থানকে 'সর্বোচ্চ কৌণিক অবস্থান' বলে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় ভূমির সঙ্গে ৪৭° কোণ করে শুক্র পশ্চিম আকাশে থাকে। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টা সময়ে এক পাক দেয়, অর্থাৎ ৩৬০°কোণ ঘুরে আসে। তাহলে, হিসাব করলে দেখা যাবে যে ৪৭° কোণ ঘুরতে পৃথিবীর তিন ঘণ্টা আট মিনিট সময় লাগে। সুতরাং ব্যাবিলনীয়দের পর্যবেক্ষণ সঠিক বলতে হবে। সূর্যাস্তের পর সবচেয়ে দেরী করে যখন শুক্র অস্ত যায় তখন এই দুই অস্ত-সময়ের পার্থক্য দাঁড়ায় তিন ঘণ্টা আট মিনিট।

এরপর, শুক্রগ্রহ আরো এগিয়ে গেলে ঐ কোণের মাপ বাড়ে তো না-ই, বরং কমে যায়। অর্থাৎ সাঁঝের তারা, 'সর্বোচ্চ কৌণিক অবস্থানে'র পর আবার দিগন্তের কাছে চলে আসে, সূর্য ও শুক্রের অস্ত যাবার সময়ের পার্থক্য কমে। শেষ পর্যন্ত সূর্য ও শুক্র প্রায় একই সময় অস্ত যায়। একসময় দুটি জ্যোতিষ্কের অস্ত যাওয়ার অর্থ তারা একসময় পূর্বে উদিত হবে। এই অবস্থানকে 'সর্বনিম্ন অবস্থান' বলে।

এই সময় পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়, যার মান মাত্র চার কোটি কিলোমিটার। সবচেয়ে মজার কথা, 'সর্বোচ্চ অবস্থানে' শুক্রের একপিঠ পুরোপুরি আমরা দেখতে পাই, এরপর ধীরে ধীরে তার কলার হ্রাস ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত 'সর্বনিম্ন অবস্থানে' শুক্রকে আর আমরা দেখতে পাই না। 'সর্বনিম্ন অবস্থানকে' এক ধরনের শুক্রের 'অমাবস্যা' বলা যেতে পারে। 'সর্বনিম্ন অবস্থানে' শুক্র আমাদের সবচেয়ে কাছে থাকে বলে সবচেয়ে বড় দেখানো উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যখন সাঁঝের তারা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, তখন তার আলোকিত অংশ পৃথিবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

তাহলে, কোন্ অবস্থানে শুক্রকে উজ্জ্বলতম দেখায়? সেকি তার ৪৭°-তে 'সর্বোচ্চ কৌণিক অবস্থান? না, তা নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, যখন প্রাসঙ্গিক কোণটির মান ৩৯° হয়, তখন শুক্রকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। এমনকি, এই সময় শুক্র পৃথিবীতে কোন বস্তুর হালকা ছায়া পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারে।

'সর্বনিম্ন অবস্থানে'র পর শুক্র আরো এগিয়ে যায়। আবার ধীরে ধীরে শুক্র-পৃথিবীর রেখা ও পৃথিবী-সূর্যের রেখার মাঝের কোণ বাড়তে থাকে। তবে এবার বিপরীত অভিমুখে। এর অর্থ, সন্ধ্যাতারার বদলে শুকতারা দেখা দেবে। পুব আকাশে সূর্য ওঠার কত আগে শুকতারা উঠবে? তা ঐ কৌণিক পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। যত দিন যাবে, তত কৌণিক পার্থক্য বাড়বে, আর তত আগে আগে শুকতারা শেষ রাতের পুব আকাশে দেখা দেবে। এভাবে ৪৭° 'সর্বোচ্চ কৌণিক অবস্থানে' শুক্রগ্রহ এলে, সূর্য ওঠার ঠিক তিন ঘণ্টা আট মিনিট আগে শুক্রের উদয় হবে। ৪৭° অবস্থান থেকে শুক্র যত এগিয়ে যাবে, তত তার কলার বৃদ্ধি হবে। ৩৯° কোণে সবচেয়ে উজ্জ্বল শুকতারা দেখতে পাবো। শুকতারা ও সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কৌণিক অবস্থানটি আবার কমতে কমতে শেষে 'সর্বোচ্চ অবস্থানে' একসময় পুব আকাশে শুক্র ও সূর্য একসঙ্গে উদিত হবে।

এক চন্দ্র-পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা আসতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় চলে যায়। অথবা সাড়ে উনত্রিশ দিন বাদে বাদে চাঁদের কোন একটা কলা ফিরে ফিরে আকাশে আসে। এই প্রশ্ন তো আমরা শুক্রের বেলায়ও করতে পারি। ঠিক কতদিন পর পর শুক্রের 'পূর্ণিমা' (সর্বোচ্চ অবস্থান) দেখতে পাবো ? বা ঠিক কতদিন পর পর শুক্রের একটি নির্দিষ্ট কলা দেখতে পাবো ? হঠাৎ মনে হতে পারে ২২৪.৭ দিন। কারণ, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শুক্রের ঠিক ২২৪.৭ দিন লাগে। কিন্তু উত্তরটি ঠিক নয়। কারণ, এই ২২৪.৭ দিনে পৃথিবী তো এক জায়গায় বসে নেই। পৃথিবীও সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তাই পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান শুক্রের কোন একটা কলার প্রত্যাবর্তনের দিন হিসাব করতে হলে, শুক্র ও পৃথিবী—উভয়ের বার্ষিক গতির কথা মনে রাখতে হবে।

৫৮৪ দিন পর পর শুক্রগ্রহর কোন একটি কলাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এর মানে হলো, আজ যদি সূর্যাস্তের সময় ভূমির ৪৭° উর্ধ্বে সন্ধ্যাতারা দেখা যায়, তাহলে আবার ৫৮৪ দিন পরে সন্ধ্যা-তারাকে ঐ জায়গায় ফিরে দেখা যাবে। ৫৮৪ দিনকে শুক্রের 'যুতিকাল' (synodic period) বলে।

বহু ব্যাপারে পৃথিবীর সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও শুক্রগ্রহ একটা বিষয়ে তুলনাহীন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে শুক্রগ্রহর পিঠে প্রতিফলিত তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, শুক্র নিজ অক্ষে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে (clockwise) ২৪৩.১ দিনে একবার ঘুরছে। অর্থাৎ শুক্রগ্রহের আহ্নিক গতি ২৪৩.১ দিন (২৪ ঘণ্টা = ১ দিন)। এই ধরনের আবর্তন সৌরজগতে বৃহস্পতি ছাড়া আর কারোর নেই। একে বিপরীত ঘূর্ণন (retrograde rotation) বলে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অভিমুখ অবশ্য ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

যদিও শুক্র ২৪৩.১ দিনে নিজেকে একপাক দিচ্ছে, তবু হিসাব মতো শুক্রের দিন-রাত ২৪৩.১ দিনে সম্পূর্ণ হয় না। কারণ ঐ সময়ে,

শুক্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান পালটে যায়। হিসাব করলে দেখা যায় যে, শুক্রগ্রহ ১১৬·৮ দিনের ফারাকে পর পর সূর্যোদয় দেখবে।

১১৬·৮ দিনকে শুক্রের এক 'সৌর দিন' (solar day) বলে। কিন্তু শুক্রের আকাশে কোন একটি দূরের নক্ষত্রের পর পর তু-বারের উদয়ের মাঝে ২৪৩·১ দিন সময় অতিবাহিত হয়। কারণ শুক্রের সাপেক্ষে ঐ দূর নক্ষত্রের অবস্থান খুব একটা পরিবর্তিত হয় না। এই ২৪৩·১ দিনকে শুক্রের এক 'নাক্ষত্র দিন' (sidereal day) বলে। পৃথিবীর সৌর দিন ও নাক্ষত্র দিনে কি কোন তফাৎ আছে? হ্যাঁ, আছে। পৃথিবীতে আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতি—তুইয়েরই অভিমুখ হলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। পৃথিবীতে পর পর তু-দিনে মধ্যাকাশে মাথার উপর দিয়ে সূর্য যাবার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা, আর কোন দূর নক্ষত্রের মধ্যগগন দিয়ে পর পর তু-দিনের অতিক্রমের বেলায় তা হলো ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট।

শুক্রের সৌরদিনের সঙ্গে তার যুতিকালের একটা সম্পর্ক আছে। তা হলো, ১১৬·৮ × ৫ = ৫৮৪। অর্থাৎ পৃথিবী সাপেক্ষে শুক্রের কোন একটি কলা প্রত্যাবর্তনের সময়ে শুক্রের পাঁচটি সৌরদিন অতি-বাহিত হয়, অর্থাৎ ঠিক পাঁচবার সূর্য শুক্রের মধ্যগগন পার হয়। এমন কাকতালীয় সামঞ্জস্য মহাকাশের তুনিয়ায় বড় একটা দেখা যায় না। শুধু কি এই?

শুক্রগ্রহ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে? আমরা যেমন দেখি শুক্রকে—ঠিক তেমনি, তবে আরো উজ্জ্বল। রাতে শুক্রের মাঝ আকাশ দিয়ে পৃথিবীকে পার হতে হবে। যদি প্রশ্ন তোলা যায়, একবার পার হওয়ার পর আরো কত দিন পরে পৃথিবী আবার শুক্রের মধ্যাকাশে আসবে? এই সময় হলো ১৪৬ দিন।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার যে ১৪৬ কে ৪ দিয়ে গুণ করলে ৫৮৪ পাওয়া যায়। অর্থাৎ পৃথিবী সাপেক্ষে কোন একটা শুক্রের কলা

প্রত্যাবর্তনের সময়ের মধ্যে পুরো চারবার পৃথিবী শুক্রের আকাশ পার হয়ে আসবে। অথবা এই ৫৮৪ দিনের মধ্যে পৃথিবী থেকে শুক্রকে চারবার আবর্তিত হতে দেখা যাবে।

মোট কথা, একটি যুতিকাল সময়ে (৫৮৪ দিন) শুক্রের মাঝ আকাশ দিয়ে পাঁচ বার সূর্য ও চার বার পৃথিবী পার হবে। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা এই হিসাব পেয়ে চমৎকৃত হয়েছেন। এমন অদ্ভুত সামঞ্জস্য আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। বহুদিক দিয়ে শুক্র সত্যি অনন্য!

আকাশপথে শুক্রের আবর্তন শুধু যে আমাদের অবাক করে তাই নয়, ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরার দরুন শুক্রের পশ্চিমে সূর্যোদয় হয়। পশ্চিমের আকাশের বাদামী রঙের বাতাস ঠেলে সূর্য আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের পৃথিবীর আকাশে সূর্য যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়, শুক্রের আকাশে কিন্তু মোটেই তা হয় না। সূর্য ধীরে ধীরে ৫৮.৪ দিনে পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্তে হাজির হয়। এর মানে হলো যে শুক্রের একটি দিনের মাপ প্রায় দু-মাস। দু-মাস ধরে মাথার উপর সূর্য! ভাবাই যায় না, সেখানে কিরকম গরম। পরের দু-মাস একাদিক্রমে রাত চলে এবং তার শেষে আবার সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়। শুক্র প্রায় গোলাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। শুক্র থেকে সূর্যের দূরত্ব তাই সারা বছর প্রায় সমান। আবার শুক্রের অক্ষ তার আবর্তন-তলের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পৃথিবীর অক্ষ তার আবর্তন-তলের সঙ্গে সাড়ে তেইশ ডিগ্রী কোণে হেলে আছে। শুক্রের অবস্থানের জন্য শুক্রে কোন ঋতু পরিবর্তন নেই, বছরের নানা সময়ে নানা তাপমাত্রা হয় না। শুক্রে অক্ষাংশ নিরপেক্ষ ঋতু দেখা যায়।

জানি না, কোনদিন মানুষ শুক্রগ্রহে যাবে কিনা; কৃত্রিম আশ্রয় গড়ে তুলবে কিনা। যদি একদিন তা হয়, তাহলে কল্পকাহিনীর গ্রহ বাস্তবে দেখা দিয়েছে বলতেই হবে।

ধুলোয় ভরা মহাকাশ

রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেবার পথে বায়ুমণ্ডল পার হতে হয়। কতো চওড়া এই বায়ুমণ্ডল? ত্ন-শ’ মাইল হবে। তারপর যে একেবারেই বাতাস নেই. তা নয়। শেষের দিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের স্তর পাতলা হতে হতে মহাকাশে মিলিয়ে যায়। যখন রকেট সত্যি সত্যি মহাকাশের ভেতরে এসে পড়ে তখনও তার সঙ্গী হিসাবে কিছুটা গ্যাস লেগে থাকে। মহাকাশ একেবারে শূন্যের দেশ নয়। মহাকাশের এক লিটার অঞ্চলে অন্তত একটি হাইড্রোজেন অণুর দেখা মিলবে।

গ্রহ-গ্রহান্তরে, নক্ষত্র-নক্ষত্রান্তরে, তারাজগত থেকে তারাজগতে পাড়ি দেবার পথে এরকমই শূন্যের দেশ পার হতে হয়—যা শূন্য হয়েও ঠিক ঠিক শূন্য নয়। শুধু কি তাই? নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে যে জগৎ, সেই জগতের আকাশে হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে ধুলোর মিশেল ছড়িয়ে থাকে। ধুলোয় ধূসরিত মহাকাশ! পৃথিবী ও তার আশপাশ, মঙ্গলের ওদিকে, সূর্যের চারধারে এমন মহাজাগতিক ধুলোর ছড়াছড়ি। কোথা থেকে এতো ধুলো আসে?

মহাকাশে নানান আকারের ছোট বড়ো উল্কা ঘুরে বেড়ায়। তারা পৃথিবীতে, চাঁদে এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে সব সময় আছড়ে পড়ছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে যে অসংখ্য ক্ষুদে পাথুরে পিণ্ড আছে, সেখান থেকেই বেশির ভাগ উল্কার আমদানী হয়। উল্কাদের অল্পই পৃথিবীর মাটিতে পৌছাতে পারে, কারণ মাঝপথে বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে তারা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যে সব উল্কা চাঁদে আঘাত করে? চাঁদে তো কোন বাতাস নেই। তাই উল্কারা সরাসরি চাঁদে নামে, চাঁদের বুকে ছোট বড়ো ক্ষতর সৃষ্টি করে, ধুলো ওড়ায় এবং তেমন জোরে

উল্কা আঘাত করলে ঐ ধুলোর ঢেউ মহাকাশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শুধু ধুলো কেন, জোরালো আঘাতে চাঁদের পাথরের টুকরো ছিট্কে বহুদূর, এমনকি পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। কিছুদিন আগে কুমেরু মহাদেশে এমন একটা পাথর পাওয়া গেছে। সে পাথরের অতীত পৃথিবীতে নেই, ভূবিজ্ঞানীরা খুঁজে দেখেছেন—ঐ পাথরের জন্ম চাঁদের মাটিতে হয়েছে।

উল্কাঘাত ছাড়া আর কিভাবে চাঁদের পাথর পৃথিবীতে আসতে পারে ? 'টেকটাইট' নামে একরকম চক্‌চকে উল্কা পৃথিবীতে পাওয়া যায়। অনেকে সন্দেহ করেন, যখন বিস্ফোরণে চাঁদের 'টাইকো' নামের ক্ষতমুখটি তৈরি হয় তখন টেকটাইটগুলো পৃথিবীতে ছিটকে এসেছিল।

এছাড়া উর্ধাকাশে যে সব উল্কারা জ্বলে যায় তাদেরও কিছু কিছু অংশ মহাকাশে ধুলায় ধূসরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যুগ যুগ ধরে মহাকাশে নানা ধরনের বস্তু পিণ্ডে সংঘর্ষ হচ্ছে, চূর্ণ হয়ে তারা ঐ ধুলোর জন্ম দিয়েছে। পাতাল রেলের কাজকর্মে কলকাতায় যেভাবে ধুলো বেড়েছে, খনি অঞ্চলে যে কারণে বাতাস ধোঁয়াটে, ঠিক তেমনি ভাবে মহাকাশের নানারকমের ঠোকাঠুকির দরুন মহাকাশ হয়ে উঠেছে ধুলোয় ভরা মহাকাশ।

পৃথিবীর বুকে বছরে গড় পড়তা পাঁচশ উল্কা আছড়ে পড়ে। এর থেকে ঢের ঢের বেশি উল্কা আকাশে জ্বলে হারিয়ে যায়। উল্কার প্রধান উপাদান লোহা, কোবাল্ট, নিকেল। এই সব ধাতুর হদিস উর্ধাকাশে পাওয়া গেছে। ১৯৫৭ সালে হান্‌স প্যাটারসন নামে জনৈক ভূপদার্থ-বিজ্ঞানী হাওয়াই দ্বীপের পাহাড়ের বাতাস পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন উল্কাধুলি বর্ষিত হয়। ভাবতে পারা যায়, সে কি বিশাল ব্যাপার !

মহাকাশের ধুলোর উৎপত্তির কারণ কেবলমাত্র উল্কা-গ্রহ, উপগ্রহে সংঘর্ষ নয়। ধূমকেতু ধ্বংস হয়েও ধুলো হয়। ধূমকেতুর গোল মস্তকে আছে পাথরের চাঁই, জমাট বরফ। ধূমকেতু কোন চিরকালীন ব্যাপার

নয়—কোন কোন ধূমকেতু মহাকাশে একসময় বিলীন হয়ে যায়। প্রতিবারই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পথে ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে আসে তখন ধূমকেতুর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে তার কলেবরকে ক্ষীণ করে। গত শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখের উপরেই 'বেইলা' নামে একটি ধূমকেতু মহাকাশে মিলিয়ে গিয়েছিল।

মহাকাশ যে ধুলোয় ধূসরিত তা বোঝা যায় 'রাশিচক্রের আলো' (zodiacal light) দেখে। রাশিচক্রের আলো কাকে বলে? মাঘ মাসে সূর্য অস্ত যাবার কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে, একটা হালকা আলোর আভা পশ্চিম দিগন্ত থেকে উঠে মাঝ আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। এর নাম রাশিচক্রের আলো। দিগন্তের কাছে এই আলো স্পষ্ট, কিন্তু উপরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেছে। শরৎকালেও সূর্য ওঠার আগে পুব আকাশে রাশিচক্রের আলো দেখা যায়।

কোথা থেকে রাশিচক্রের আলো আসে? মহাকাশে বিশেষ অঞ্চলে মহাজাগতিক ধুলোর পরিমাণ বেশি থাকে—সেজন্য বছরের কোন একটি বিশেষ সময়ে উল্কাপাত ঘটে সর্বাধিক। পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে যে সময়ে ঐ ধুলোভরা অঞ্চলে হাজির হয় তখন সূর্যোদয়ের আগেই সূর্যালোক ধুলোকণায় প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। মনে রাখতে হবে যে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় যে রক্তিম সূর্য আমরা দেখি বা যে বর্ণাঢ্য আকাশ দেখি তা-ও ধুলোয় প্রাতফলিত-প্রতিক্ষিপ্ত সূর্যালোকের ফল, তবে এ ধুলো পৃথিবীর ধুলো—মাটি থেকে কিছুটা উপরে ছড়ানো মাত্র। কিন্তু রাশিচক্রের আলো যে ধুলোর প্রতিফলনে জন্ম নেয় তা মহাকাশের অঙ্গ।

মহাকাশের এত ধুলো চিরকাল এমনিভাবে অবহেলায় পড়ে থাকে না। একদিন হাইড্রোজেন গ্যাস, ধুলো সবাই মিলে মিশে গ্রহ, নক্ষত্রের জন্ম দেয়। কালের হাতে একসময় ঐ গ্রহ, নক্ষত্রেরও বিনাশ হয় - আবার ধুলো গ্যাস ফিরে আসে। যুগ যুগ ধরে মহাকাশের রথচক্রে এই চলছে, চলবে।

দূরের নক্ষত্র থেকে যে আলো ভেসে আসে তার মধ্যে লুকানো আছে নক্ষত্রের খবর। সেই আলো যদি যন্ত্রের সামনে মেলে ধরা হয়, যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে নক্ষত্রের স্বরূপ জানা যাবে। নক্ষত্রের উষ্ণতা কত, কি কি পদার্থ তাতে আছে তা জানার পথ ঐ একটি—আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করা।

লাল, নীল, বেগুনী—কত রকমের রঙ একসঙ্গে ভেসে আসে। লালের জোর কম, বেগুনীর জোর বেশি। যে রঙের যত ছোট তরঙ্গ, তার তত বেশি জোর, কোন বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতাও বেশি। নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা ঢিল ছুঁড়লে ঢেউ ওঠে, পর পর অনেক ঢেউ। ঢেউগুলি থরে থরে নাচতে নাচতে পাড়ের দিকে যায়। একটা ঢেউ-এর এক মাথা থেকে পরের ঢেউ-এর অন্য মাথা যত দূরে তাকে আমরা 'তরঙ্গ দৈর্ঘ্য' বলি। একটা জায়গার উপর দিয়ে এক সেকেণ্ডে যতগুলি ঢেউ পর পর পার হয়, তার নাম ঢেউ-এর 'কম্পন সংখ্যা'। বড়ো বড়ো ঢেউ হলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে অল্প ঢেউ-ই এভাবে পার হতে পারে। তার মানে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বাড়ে—কম্পন সংখ্যা তত কমে।

নক্ষত্রের আলোর ঐ যে লাল, নীল, বেগুনী অংশ, তাদের প্রত্যেকের কম্পন সংখ্যা আলাদা। আলোগুলি এক রকমের ঢেউ, সবার গতিবেগ সমান, তফাৎ শুধু তাদের কম্পন সংখ্যায় বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে।

দূর দেশের একটি নক্ষত্র যে আলো পাঠাচ্ছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হল, আলোর মধ্যে কোন্ কোন্ রঙ আছে দেখা হল, তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা হল। নক্ষত্রটির যদি হঠাৎ কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে

তার আলোর পরিবর্তন হবে না বা রঙের পরিবর্তন চোখে পড়বে না। নিরবধিকাল সেই তারা একই আলো, একই রঙ পাঠিয়ে যাবে।

কিন্তু সত্যি কি তাই হয়? না, হয় না। দূরের নক্ষত্রের আলো, ভিন্ন তারাজগতের আলোর বা তার বর্ণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

ধরা যাক, একটি নক্ষত্র বেগুনী রঙের আলো পাঠাচ্ছে। তার মানে, বেগুনী রঙের মানানসই তরঙ্গ পর পর পাঠিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশের অন্ধকার ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেই তরঙ্গগুলি একে একে পৃথিবীতে এসে আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে। নক্ষত্রটি এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কতগুলি বেগুনী রঙের তরঙ্গ পাঠাবে? বেগুনী রঙের কম্পন সংখ্যা যত, ঠিক তত। এই কম্পন সংখ্যাটি মাপে খুবই বড়ো—সাতের পর চোদ্দটি শূন্য (৭×১০^{১৪}) বসালে যে সংখ্যা হয়, তাই। ভাবা যায়, এক সেকেণ্ডের মধ্যে ওই সাত কোটি কোটি তরঙ্গ আমাদের চোখের পর্দায় ধরা দেয়!

এখন কোন কারণে যদি নক্ষত্রটি স্থির না থেকে ক্রমশ দূরে চলে যায় তা হলে কি আর সাত কোটি কোটি তরঙ্গ আসবে? না, চোখে পড়বে তার চেয়ে কম তরঙ্গ। দূরে চলে যাওয়ার দরুন, এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কিছু তরঙ্গ আর এসে পৌঁছাতে পারবে না। আবার, নক্ষত্রটি যদি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তবে আমরা এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সাত কোটি কোটির থেকে বেশি তরঙ্গ দেখতে পাবো। এটা কি করে সম্ভব? একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

একটা ঘরের কোণে টেবিল ফ্যান ঘুরছে। তার হাওয়া ছুটে ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো একজন মানুষের গায়ে লাগছে। এবার যদি টেবিল ফ্যানটিকে দ্রুত মানুষটির দিকে টেনে আনা যায়, অথবা মানুষটি ছুটে ফ্যানের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে তার গায়ে হাওয়া লাগবে আরো জোরে। ফ্যান এবং মানুষ—একটি নির্দিষ্ট তফাতে স্থির হয়ে থাকলে যত হাওয়ার কণা মানুষের গায়ে লাগে, তাদের মধ্যের

ফারাকটা দ্রুত কমে এলে তার থেকে বেশি হাওয়া-কণা গায়ে আছড়ে পড়বে। এ রকম আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

ধরা যাক, কোন রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় হুইসেল বাজাতে বাজাতে একটি মেল ট্রেন দূর থেকে ছুটে এসে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ঐ ব্যক্তি ট্রেনের হুইসেলের আওয়াজ শুনবেন, তবে তা এক রকমের আওয়াজ নয়। ট্রেন যত তার দিকে এগিয়ে আসবে তত আওয়াজ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হবে। তারপর, ট্রেন ঐ ব্যক্তিকে পার হলে, ট্রেন যত ব্যক্তি থেকে দূরে যাবে, তত আওয়াজ আবার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ক্রমশ মোটা হয়ে পড়বে।

এ সবের কারণ কি? যখন টেবিল ফ্যান ও মানুষ দু'টি জায়গায় স্থির হয়ে ছিল তখন ঐ ফ্যান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হাওয়া দিচ্ছিল এবং মানুষের গায়ে লাগছিল। এখন যদি ফ্যানকে দ্রুত মানুষের দিকে টেনে আনা হয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট হাওয়ার সঙ্গে, এগিয়ে আসার দরুন আরো কিছুটা বাড়তি হাওয়া যোগ দিয়ে মোট হাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। আবার, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি থেকে কিছু দূরে ইঞ্জিনটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যদি হুইসেল দিত তবে বাতাসে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক তুলে শব্দ ঐ ব্যক্তির কানে ঢুকতো। কিন্তু ট্রেন অগ্রসর হলে, যত তরঙ্গ ঐ ব্যক্তির কানে প্রবেশ করছিল, তার সঙ্গে আরো কিছু বাড়তি তরঙ্গ ওখানে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। তরঙ্গ সংখ্যা বাড়ার অর্থ কম্পাঙ্ক বাড়া। বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ তীক্ষ্ণ শোনায়। এজন্যই ট্রেন যখন স্টেশন ছেড়ে চলে যায় তখন শব্দের কম্পাঙ্ক ক্রমশ কমতে থাকে, শব্দ তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ক্রমশ মোটা হতে থাকে।

তরঙ্গ প্রেরক কোন পদার্থের এভাবে অগ্রসর বা পশ্চাদপসারণের জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। অষ্ট্রীয়ান বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান জোহান ডপলার এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা করেছিলেন বলে এই ঘটনাকে 'ডপলার ঘটনা' বলে।

যাই হোক, ভিন্ন তারাজগতের নক্ষত্রের আলো পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় নীল আলো যে মাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাঠায়, নক্ষত্রের প্রেরিত আলোয় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ছে। এমনিভাবে সবুজ আলো, হলুদ আলো, লাল আলো—সবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তির দিকে। দৃশ্যমান সব আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। নক্ষত্র থেকে ভেসে আসা সব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ছে, অর্থাৎ সব আলো লালের দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য ওই ঘটনাকে 'লোহিত সরণ' (red shift) বলা হয়।

লোহিত সরণের একটিই ব্যাখ্যা সম্ভব। দূরের তারাজগতগুলি ক্রমশ আমাদের পৃথিবী ও সূর্য বা আমাদের তারাজগত থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। নক্ষত্রেরা পিছু হটছে, একটি নক্ষত্র অন্যটির থেকে সরে যাচ্ছে। নক্ষত্রগুলি একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাওয়ার অর্থ—আমাদের বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। নক্ষত্র নিয়েই তো বিশ্ব তৈরি, যত দূর নক্ষত্র তত দূর বিশ্বের সীমানা। এই সীমানা আর ঠিক থাকছে না, ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে।

প্রসারিত বিশ্ব নিয়ে আমাদের নানা সমস্যা। কোথায় প্রসারিত হচ্ছে ? কেন বিশ্বজগৎ স্থির নয়, অনড় অচল অব্যয় নয় ? প্রসারণ কি থামবে না ? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। জানি না ভবিষ্যতে কোন দিন এই বিশ্বস্ফীতির কারণ জানা যাবে কি না।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের শোভা দেখতে আমরা সকলেই ভালবাসি। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় বা নেতারহাটের ম্যাগনোলিয়া পয়েণ্ট থেকে সূর্যাস্তকে চোখ ভরে দেখতে আমরা পয়সা খরচ করে ছুটি। ঘরের কাছে মাঠের ওপারে সূর্যাস্তই বা কম সুন্দর কি! সূর্যাস্তের আগে নীল আকাশে আবছা পাটকেলে রঙ ধরে, মেঘে মেঘে লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ে, রক্তিম সূর্য ধীরে ধীরে পাটে বসেন। কিছুটা চ্যাপ্টা ও বড়ো আকারের সূর্য ক্রমে দিগন্তের ওপারে হারিয়ে যায়। তারপর অল্পক্ষণ গোধূলির আলো থাকে। গোধূলির আলো মুছে দিয়ে এক সময় রাতের অন্ধকার নেমে আসে পৃথিবীতে।

যদি পশ্চিম আকাশে মেঘ থাকে, যদি বাতাসে ধুলো থাকে, তাহলে সূর্যাস্তের শোভা আরো মনোরম হয়। কয়েক বছর আগে মেক্সিকোয় একটি আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ টন ধুলো, গ্যাস উর্ধাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তারপর কয়েক বছর মেক্সিকোর আকাশে সূর্যাস্তের ঘনঘটা সবাই লক্ষ্য করেছিলেন—অসম্ভব রকমের লাল সূর্য অনেকক্ষণ ধরে নানান বর্ণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে অস্তমিত হতো। চমৎকার সেই দৃশ্য!

আমরা সকলেই জানি, সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের আলোকে লম্বা ধুলোমাখা বাতাসের পথ পাড়ি দিতে হয়। দিগন্তের সূর্যের আলো মাটির অল্প উপর দিয়ে যায়। ধুলো কণা সূর্যের আলোকে বিচ্ছুরিত করে কেবলমাত্র লাল রঙকে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে। তাই, আকাশে ধুলো বাড়লে সূর্যকে আরো লাল দেখাবে, আরো মনোহর বলে মনে হবে।

পৃথিবীতে বসে সুন্দর সূর্যাস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল গ্রহর মাটিতে বসে সূর্যাস্ত দেখার কথা মনে করা যেতে পারে। অবশ্য, কোন মানুষ মঙ্গলে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখেনি, তবে মহাকাশযান 'ভাইকিং' মঙ্গলে নেমে একটি অসাধারণ সূর্যাস্তের রঙিন ফটোগ্রাফ তুলেছিল। আমরা ঐ ফটোর কথা বলছি।

অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকে দেখা সূর্যাস্তের তেমন সৌন্দর্য নেই। বুধ ও চাঁদে বাতাস নেই, তেমন ধুলোও তাদের আকাশে ভাসে না, সূর্যাস্ত মোটেই নয়নাভিরাম নয়। শুক্র গ্রহের বাতাস বড়ো ঘন, ধোঁয়াময়, দমবন্ধ করা। এমন বাতাসে বাস করে সূর্যই ভালো করে দেখা যায় না, তো সূর্যাস্ত! বৃহস্পতি, শনি—এরা তো প্রায় গ্যাসের তৈরি গ্রহ, সূর্যাস্ত দেখার কথা ওঠে না।

এদের তুলনায় মঙ্গলে অনেক সুবিধা। মঙ্গলে বাতাস আছে, তবে তা পাতলা, পৃথিবীর বাতাসের তুলনায় শতগুণে পাতলা, ফুরফুরে। মঙ্গলের বাতাসে ধুলোও আছে। তাই মঙ্গলের মাটিতে বসে সূর্যাস্ত দেখাটা কম মনোহারী নয়, বরং কোন কোন অর্থে পৃথিবীর সূর্যাস্ত থেকে মঙ্গলের সূর্যাস্তগুলি বেশি আকর্ষণীয়। পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব, তার থেকে ঢের দূরে মঙ্গল অবস্থান করে। তাই মঙ্গল থেকে সূর্যকে দেখতে আরো ছোট দেখায়। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, মঙ্গল থেকে সূর্যকে যা দেখায় তার আড়াইগুণ মাপে বড়ো দেখায় পৃথিবী থেকে। অর্থাৎ, মঙ্গলের আকাশে সূর্য যেন একটি ছোট্ট টিপ, ঐ টিপ থেকে আলো আসছে, তাপ আসছে, অবশ্য তা পৃথিবীর তুলনায় বেশ কম।

পৃথিবীর আকাশ ঘন নীল, একমাত্র সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় দিগন্তের আকাশ রক্তিমাভ হয়। অথচ মঙ্গলের আকাশ মোটেই নীল নয়, বরং আবছা গোলাপী রঙ তাতে ছড়ানো আছে। কেন? কেন এই পার্থক্য?

পৃথিবীর বাতাসের বেশির ভাগ তৈরি হয়েছে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে, তার সঙ্গে আছে অক্সিজেন গ্যাস, জলীয় বাষ্প, ধুলো কণা, এমন

কত কি। নাইট্রোজেন গ্যাসের আলো বিচ্ছুরণ করার ক্ষমতা প্রচুর, এর নাম 'র‍্যালে বিচ্ছুরণ'। বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে ঐ বিচ্ছুরণের গাণিতিক হিসাব করেছিলেন বলে তার নামে নামকরণ হয়েছে। নাইট্রোজেন গ্যাস সূর্যের সাদা আলোর মধ্যের লাল, হলুদ, সবুজ আলো বিচ্ছুরিত করে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দেয়, কেবলমাত্র নীল রঙকে আসতে দেয়। আমরা সেজন্য আকাশকে নীল দেখি। কিন্তু ঐ সূর্যই যখন সূর্যাস্তের পথে, তখন তার আলো দীর্ঘ বায়ুপথ পার হয়ে আসে, আলোর সঙ্গে ধুলোবালির, জলকণার দেখা হয়। এরা আবার নীল সমেত অন্য রঙকে বিচ্ছুরিত করে কেবলমাত্র লাল আলোকে আসতে পথ করে দেয়। তাই সূর্যাস্তের সূর্য, আকাশ সব লালে লাল।

শরতকালের আকাশ ঘন নীল। কারণ শরতের বাতাস নির্মল, ধুলোবালির লেশমাত্র নেই। কেবলমাত্র নাইট্রোজেনের কারণে আকাশকে নীল দেখায়। ধোঁয়াধুলোর জন্য যে তা বিচ্ছুরিত হয়ে যাবে তার উপায় নেই। শহর শিল্পাঞ্চলের আকাশে তেমন নীলের সমারোহ নেই, কারণ শিল্পাঞ্চলের বাতাস ধুলোয় মলিন, সেই ধুলো কিছুটা নীল রঙকে বিচ্ছুরিত করে ভিনপথে পাঠিয়ে দেয়।

মঙ্গল গ্রহর বাতাস খুব পাতলা, তাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে। অন্য যা উপাদান আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আর মঙ্গলের মাটি থেকে হালকা লাল ধুলোকণা বাতাসে ভেসে ওঠে। মঙ্গলে মৃদু বায়ুপ্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গলের বাতাসে নাইট্রোজেন নেই বলে মঙ্গলের আকাশ একেবারেই নীল হয় না, বরং সেখানে সূর্যের আলো সব সময় ধুলোর মধ্য দিয়ে আসে, সেজন্য লাল ভিন্ন অন্য সব রঙ বিচ্ছুরিত হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। তাই মঙ্গলের আকাশ দেখতে লাল—হালকা লাল, গোলাপী।

এমন মঙ্গলে যখন সূর্যাস্ত হয় তখন লালের ঘনঘটা দেখার মতো! এমনিতেই মঙ্গলের মাটি লাল। ভাইকিং-এর তোলা ছবিতে আমরা দেখছি—নিষ্করুণ, প্রাণহীন, জলহীন মঙ্গলের প্রান্তর, এবড়ো খেবড়ো

লাল পাথরের চাঁই লাল ধুলো বালির মধ্যে ছড়ানো আছে। যতদূর নজর যায় এমন ভয়াবহ দৃশ্য। পৃথিবীর প্রাণহীন মরুভূমির দৃশ্যের সঙ্গে এর একমাত্র তুলনা চলে। মঙ্গলের মাটি যে লাল, তার কারণ তাতে প্রচুর পরিমাণে লোহার অক্সাইড আছে ; মঙ্গলকে একরকম জং-ধরা গ্রহ বলতে পারি। সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো ধুলোভরা পথ পাড়ি দেয়। তাই মঙ্গলের সূর্যাস্ত বলতে বুঝি—যেন আকাশে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেছে, তার মধ্য দিয়ে লাল রঙের টিপ মাপের সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের ওপারে হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হায়, এমন দৃশ্য সেখানে কে দেখবে, কে প্রশংসা করবে ? শেষে পৃথিবী থেকে মানুষকে গিয়ে মঙ্গলের সূর্যাস্তকে বাহবা দিতে হবে, তাছাড়া আর উপায় কি !

ধ্রুবতারা ধ্রুব নয় !

কথাটা অবাক হবার মতো। সবাই জানে, উত্তর আকাশের এই তারাটি এক জায়গায় স্থির বলেই তার নাম 'ধ্রুবতারা'। তাহলে ? এর সঙ্গে যদি শোনা যায়, আজ যে তারাটি 'ধ্রুবতারা', হাজার দশেক বছর আগে আর একটি তারা 'ধ্রুবতারা' ছিল, দশ হাজার বছর পরে আবার অন্য কোন তারা হবে 'ধ্রুবতারা', তাহলে আরো ঘাবড়ে যাওয়ার কথা। কথাগুলো বেশ হেঁয়ালি শোনাচ্ছে। আর হেঁয়ালী না করে যা সত্যি তাই বলি।

রাতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা রাজত্ব করে। সপ্তর্ষি, কাল-পুরুষ, লুব্ধক, বৃহস্পতি, শনি—কত গ্রহ নক্ষত্র আকাশ পথে বিচরণ করে। জ্যোতিষ্করা চিরকাল মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এসেছে। মহাকাশের নানান গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে আমাদের পৃথিবীর বাস। দিন নেই, রাত নেই—পৃথিবী আবর্তিত হতে হতে সূর্যকে পরিক্রমা করছে।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে একটি সরলরেখা কল্পনা করি। আমরা একে পৃথিবীর অক্ষরেখা বলি। পৃথিবী চব্বিশ ঘন্টা অক্ষরেখার চারপাশে পাক দিচ্ছে, ঠিক যেমন একটা লাটিম তার আলের (পেরেকের) চারপাশে পাক দেয়। পৃথিবীর এই আহ্নিক আবর্তনের জন্য দিন ও রাত সম্ভব হয়েছে। কল্পনায় অক্ষরেখাকে দু'দিকে বিস্তৃত করে, উত্তর মেরু থেকে উপরের দিকে অক্ষরেখা ধরে বরাবর এগিয়ে গেলে—বহু বহু দূরে এই রেখার উপরে একটি নক্ষত্র পাওয়া যাবে। এই নক্ষত্রটি 'ধ্রুবতারা' (pole star)। উত্তর মেরুর ঠিক মাথার উপরে আছে ধ্রুবতারা, যত উত্তর মেরু থেকে বিষুব রেখার দিকে এগোনো

যাবে ততই ধ্রুবতারা মধ্য আকাশ ছেড়ে উত্তর আকাশ বেয়ে দিগন্ত-রেখার দিকে নেমে আসবে। শেষে বিষুব রেখায় হাজির হলে ধ্রুবতারাকে পাওয়া যাবে একেবারে দিগন্তে। দক্ষিণ গোলার্ধে গিয়ে পৌঁছালে আর ধ্রুবতারাকে দেখা যাবে না।

প্রাচীনকালে উত্তর গোলার্ধের নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখে দিক ঠিক করতো। কেন? কারণ, বাকি সব তারাই রাত বাড়লে স্থান বদল করে—কেবল ধ্রুবতারাই স্থির, অকম্পিত। কি করে তা সম্ভব?

নক্ষত্রখচিত আকাশকে সারারাত ধরে লক্ষ্য করা যাক। দেখা যাবে যে, তারাগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দিচ্ছে, ঠিক যেমন দিনের বেলায় সূর্যদেব পূব আকাশ থেকে পশ্চিমে এগিয়ে যায়। পৃথিবী তার অক্ষরেখার চারধারে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরে যাচ্ছে। তাই জ্যোতিষ্করা যেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরছে, এমন বোধ হয়। চলন্ত রেলগাড়ী থেকে দেখা পিছনে ধাবমান গাছপালার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। অক্ষরেখার চারধারে পৃথিবী আবর্তন করে, কিন্তু অক্ষরেখা তো স্থির। তাই অক্ষরেখার উপর অবস্থিত যে ধ্রুবতারা, তাকেও আমরা স্থির দেখবো, পৃথিবীর আবর্তন সাপেক্ষে তার কোন পরিবর্তন নেই। সমুদ্রে দিকভুল নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিক বুঝে নিত।

আজ থেকে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যে গ্রীসদেশ তখন উন্নতির শিখরে। আর্কিমিডিস, অ্যারিষ্টটল, ইউক্লিড, টলেমির দেশ গ্রীস। সে দেশের জ্যোতির্বিদ হিপ্পারকুস একদিন পুরানো নথিপত্র ঘাঁটছিলেন। তাঁর হাতে উঠে এলো প্রায় একশ' বছর আগেকার রাতের আকাশের মানচিত্র – কোন্ জ্যোতির্বিদ না জানি তা এঁকেছিলেন। হিপ্পারকুস দেখলেন যে শতাব্দী পুরানো সেই মানচিত্রে যেখানে যে নক্ষত্র দেখানো আছে, তাঁর সময়ের আকাশে সে সব নক্ষত্রের অবস্থান কিছুটা বদলে গেছে। যেমন ধরা যাক, লুব্ধক নক্ষত্র। রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নাম লুব্ধক। ঠিক একশ বছর আগে রাত বারোটায় আকাশের যেখানে লুব্ধক ছিল,

আজ রাত বারোটায় লুব্ধক আর সেখানে নেই—একটু সরে গেছে। শুধু লুব্ধক কেন, বাকি সব তারাও এমনি করে একটু সরে গেছে।

এর কারণ কি হতে পারে? আমরা তো সবাই জানি, পৃথিবীর অক্ষরেখা, যে তলে পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করে, তার লম্বর সঙ্গে প্রায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রী কোণ করে হেলে আছে। এই হেলানো পৃথিবীতে আমরা বাস করি এবং হেলে থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রজগৎ ইত্যাদি অবলোকন করি। এখন যদি কখনও এই হেলানো কোণ দিক বদল করে, বাড়ে বা কমে—তাহলেই আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান পাল্টে যাওয়া দেখবো, অন্যথায় নয়। হিপ্পারকুস অঙ্ক কষে একটা হিসাব বের করলেন। পৃথিবীর অক্ষরেখা, প্রতি বছরে এক ডিগ্রী কোণের বাহাত্তর ভাগের এক ভাগ (বা পঞ্চাশ সেকেণ্ড) পরিমাণ ঘুরে যায়। অক্ষরেখার এই ঘূর্ণনকে 'অয়নচলন' (precession) বলে। ব্যাপারটা কিরকম?

লাট্টু ঘোরানোর মতো। লাট্টু যখন জোরে ঘোরে তখন লাট্টু আল বা পেরেকের উপর সটান দাঁড়িয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরে। কিন্তু যখন লাট্টুর দম ফুরিয়ে আসে? লাট্টু সে সময় পেরেকের চারদিকে হেলে পড়ে ঢুলে ঢুলে ঘোরে। তারপর একসময় দম হারিয়ে পড়ে যায়। পৃথিবীও দম হারা লাট্টুর মতো হেলে পড়ে ঘোরে এবং অক্ষরেখার পুরো এক পাক খেতে সময় লাগে প্রায় ২৬০০০ বছর।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীর তিনরকমের গতি আছে। এক, ৩৬৫ দিনে সে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। দুই, চব্বিশ ঘণ্টায় সে তার অক্ষরেখার চারদিকে এক পাক দেয়। তিন, পৃথিবীর অক্ষরেখাটি একটা শঙ্কুর আকৃতি করে ২৬০০০ বছরে একবার পুরো ঘুরে নেয়।

এভাবে ঘুরপাক খাওয়া পৃথিবীর কি দশা হয়? ধরা যাক আজ সূর্য মকরক্রান্তি রেখার (২৩½° দক্ষিণ) উপর লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে। আমরা আশা করবো যে প্রতি বছরই এই দিনে সূর্য মকরক্রান্তি রেখাতে

লম্বভাবে কিরণ দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। কি হয়? মকর-ক্রান্তিতে লম্বভাবে কিরণ দেবার তারিখ একটু একটু করে সরে যায়। তের হাজার বছর পর দেখা যাবে যে ছয় মাস পর সূর্য মকরক্রান্তিতে খাড়াভাবে তাপ ও আলো ঢালছে। আরো তের হাজার বছর পর সূর্য আবার আগের তারিখে মকরক্রান্তিতে লম্বভাবে কিরণ দেবে। এই নিয়ম চলছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। লম্বভাবে কিরণ দেবার এই তারিখ বদলের একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। পৃথিবীতে যে একবার তুষার যুগ এসেছে, একবার পিছিয়েছে—তারও কারণ এই পৃথিবীর অক্ষরেখার দিক বদল।

পৃথিবীর অক্ষরেখা দিক বদল করে বলে, যুগে যুগে একটা বিশেষ তারা আর ধ্রুবতারা থাকতে পারে না। যখন যে নক্ষত্র অক্ষরেখার পথে পড়বে—সেই হবে তখনকার ধ্রুবতারা। যেমন সাড়ে চার হাজার বছর আগে আলফা-ড্রাকোনিস নামের একটি নক্ষত্র ধ্রুবতারা বলে চিহ্নিত ছিল, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পর আলফা সেফি নামে অন্য একটি নক্ষত্র ধ্রুবতারা হবে, বারো হাজার বছর পর ভেগা নক্ষত্র ধ্রুবতারা হবে।

এটাই আসল কথা। ধ্রুবতারা ধ্রুব নয়। ধ্রুব বলে কিছুই নেই, সবই পরিবর্তনশীল।

জীবন্ত উপগ্রহ

গত দু' দশকে গ্রহ উপগ্রহের যত সুদৃশ্য ছবি তোলা হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কোন্‌টি ? কোন্ চিত্র দেখে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে মোহিত হয়েছেন ? বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়েছেন ?

সেই ছবিটি হ'ল—ভয়জার-১ থেকে তোলা বৃহস্পতির উপগ্রহ 'আইয়োর' ছবি। সে তো কেবলই ছবি নয়, সে ছবি জীবন্ত, অতিমাত্রায় বাঙ্ময়। আইয়ো একটি জীবন্ত উপগ্রহ !

অনেকদিন ধরে আইয়ো আমাদের পরিচিত। বৃহস্পতির গ্রহগুলির মধ্যে একটি এই আইয়ো, গ্যালিলিও তাঁর সেই সেকেলে দূরবীণ দিয়ে একে আবিষ্কার করেছিলেন। রোমার সাহেব আইয়োর গ্রহণের উপর পরীক্ষা চালিয়ে আলোর গতিবেগ মেপেছিলেন। এর অনেক পরে, আধুনিক দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে আইয়োর রক্তিম মেরুদেশের হদিশ পাওয়া গেল। পৃথিবীর দুই মেরু বরফশুভ্র, মঙ্গলের মেরুদুটিও শ্বেত কার্বন ডাইঅক্সাইডের কঠিনে আবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে লাল রঙের মেরু ? কিভাবে তা সম্ভব ? বিজ্ঞানীসমাজ ভেবেই উঠতে পারলেন না।

এরও কিছুকাল পর, আইয়োর গাঢ় কমলা রঙের আকাশের পরিচয় পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, সেই আকাশে সোডিয়াম ধাতুর ছড়াছড়ি। সোডিয়াম স্ট্রীট ল্যাম্প যেমন গাঢ় হলুদ আলো ছড়ায়, ঠিক তেমনি হলুদের আভা বিস্তারিত হয়ে আছে আইয়োর আকাশে। মহাকাশে বিচরণের পথে আইয়ো লাল ধুলো ছড়িয়ে রাখে। এসব কারণে, ভয়জার-১ যখন আইয়োর পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তার ছবি তুলছিল, বিজ্ঞানীরা গভীর আগ্রহে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে তা দেখছিলেন।

সেদিন লিণ্ডা মেরাবিটো নামে এক মহিলা রাত জেগে বসেছিলেন

যন্ত্রের সামনে। টি. ভি. পর্দায় ভাসছে এক ফালি আইয়োর ছবি। দিগন্তের ওপার থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটছে আইয়োর মাঠিতে। হঠাৎ পর্দার দিকে ঝুঁকে পড়লেন মেরাবিটো। কি ব্যাপার? একটা অস্পষ্ট ধুলো গ্যাসের মেঘ আকাশ ফুড়ে শতাধিক মাইল উঠে বঙ্কিমভঙ্গীতে পড়ে যাচ্ছে—তার সঙ্গে আছে পাথর-গ্যাস-ধুলো-ধোঁয়া। সূর্যের আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখা গেল—এরকম একটি নয়, একাধিক আগ্নেয়গিরি আইয়োর বুকে সক্রিয়। পৃথিবীর পরে সৌরজগতে আর কোন গ্রহ উপগ্রহ নেই যা অগ্ন্যুৎপাতে জীবন্ত। আইয়োর গভীরে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি এখনো সক্রিয়, ভূতত্ত্বের বিচারে আইয়ো নবীন। কোটি কোটি বছর পূর্বের সেই অস্থির পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি যেন এই আইয়ো। আইয়ো দর্শন করে যেন আমাদের প্রাচীন ধারত্রীকেই দেখলাম।

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে জলীয় বাষ্পের ধোঁয়া বের হয়। আইয়ো উপগ্রহে প্রায় জল নেই, তাই সেখানের অগ্ন্যুৎপাতের মূল উপাদান হল সালফার বা গন্ধক। পৃথিবীতে গন্ধকের লাভা মাঝে মধ্যে দেখা মিললেও আইয়োর সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না। সত্যি বলতে, আইয়োর চারদিকে গন্ধক, শুধুই গন্ধক। আগ্নেয়গিরি থেকে গন্ধকের বাষ্প উঠছে, উর্ধাকাশে শতাধিক মাইল ঠেলে উঠছে সেই বাষ্প, তারপর শীতল পরিবেশে তা জমে গিয়ে বৃষ্টির মতো আবার আইয়োর বুকে ঝড়ে পড়ছে, নিম্নভূমিতে তরল সালফার ডাইঅক্সাইড জমে আছে। সমস্ত ছবিটা রোমাঞ্চকর! এ যেন বিজ্ঞান নয়, বাস্তব নয়, কল্পবিজ্ঞান!

আইয়োর বুকে আগ্নেয়গিরির প্রাচুর্যের জন্য স্বয়ং বৃহস্পতিই দায়ী। আইয়োর তুলনার বৃহস্পতি শত শত গুণে বড়ো। এত কাছে এত বড়ো একটা গ্রহ এমন জোয়ারের টান দিচ্ছে যে আইয়োর পেটের ভিতরের সব-কিছু গুলিয়ে উঠছে। আইয়োর পেটের গলন্ত সালফার বৃহস্পতির টানে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

আইয়ো বেশ ছোট উপগ্রহ বলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা কম।

আইয়োর শরীর থেকে যেসব কমলা, লাল রঙের পদার্থ ঊর্ধ্বাকাশে উঠে আসছে, তাদের একটা অংশ আর আইয়োর টানের অধীনে থাকছে না। মহাকাশে আইয়োর বিচরণ পথে তারা ছড়িয়ে পড়ছে—ঠিক যেমন রাস্তার দু'পাশে ধুলো ছড়ানো থাকে। সুদূর ভবিষ্যতে ওই ধুলো একটি বলয়ও তৈরি করতে পারে।

আইয়োর অবস্থান গ্রহণাপুঞ্জদের নিকটে। তাই অনেকে আশা করেছিলেন যে আইয়োর বুকে উল্কাখণ্ডের আঘাত দেখা যাবে, চোখে পড়বে উল্কাজাত ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু না, সেরকম কিছু ভয়জার-১ দেখেনি। কারণ পরিষ্কার। সাদা অগ্ন্যুৎপাতে ব্যস্ত আইয়ো তার বুকের যে কোন পুরানো চিহ্নকে মুছে দিচ্ছে। গন্ধকের ঢেউ এসে মুছে দিচ্ছে উল্কাপাতের ক্ষতকে। এভাবে আইয়ো সদাই নতুন, সদাই পরিচ্ছন্ন।

'নাসা' কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে 'গ্যালিলিও' নামের একটি মহাকাশ-যান বৃহস্পতির উপর গবেষণা করার জন্য পাঠাচ্ছে। আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। 'গ্যালিলিও' আইয়োর সম্পর্কে আরো কত বিস্ময়কর তথ্যই না আমাদের উপহার দেবে!

শনির দশা

শনির দশা? নাম শুনেই মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানে আবার এসব কেন? শনির দশা, রাহুর কোপ তো হাত দেখা-ভাগ্য গোনার ব্যাপার। এরা বিজ্ঞান হল কবে থেকে?

না, এ শনির দশা সে শনির দশা নয়। খোদ শনি গ্রহর একটা ব্যাপার থেকে এ নাম এসেছে। শনি ঠিক আর পাঁচটা গ্রহর মতো নয়—শনির চারধারের বলয়ে তার অসাধারণত্ব। গোল আংটার টুপি পরে শনি আকাশে ভাসে—এমন সৌন্দর্য আর কারই বা আছে?

সেই যে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও শনির বলয় আবিষ্কার করলেন, তারপর থেকে ও নিয়ে মানুষের কল্পনার শেষ নেই। এক সময় ধারণা ছিল শনির একটি বলয় আছে। তারপর মনে করা হল—না, তিনটি। সম্প্রতি ভয়জার ২-এর পাঠানো ছবিগুলি দেখে বোধ হচ্ছে—একটি দুটি নয়, শনিকে চারধার থেকে ছোট বড় হাজার হাজার বলয় ঘিরে আছে। বলয়গুলি কি ধোঁয়া? না। ভয়জার বলছে—ছোট বড় নানান মাপের পাথর, বরফের চাঁই দিয়ে বলয় তৈরি হয়েছে। এবড়ো খেবড়ো তিন চার ফুটি ঢেলাগুলি বাঁই বাঁই করে শনির চারধারে ঘুরছে। এক জায়গায় একরাশ পাথরের টুকরোগুলোকে দূর থেকে ঝাপসা ধোঁয়ার মতো দেখায়। বলয়গুলো এক হিসাবে হতভাগ্য, তারা শনির চাঁদ হতে গিয়েও হতে পারলো না। কথাটা একটু হেঁয়ালী শোনাচ্ছে, বুঝিয়ে বলি।

আমাদের গ্রহগুলির চারপাশে যে উপগ্রহ আছে তাদের জন্মরহস্যের উপর একটি মত প্রচলিত আছে। মহাকাশে এক সময় গ্রহ উপগ্রহ, এরা কিছুই ছিল না, ছিল শুধু গ্যাসের মেঘ, ধুলো। ধুলো, মেঘ জড়ো

হয়ে হয়ে প্রথমে ছোট দানা, তারপর বড় বড় চাঁই, তারও পর বিরাট মাপের গ্রহ উপগ্রহগুলি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এভাবে পৃথিবীর চাঁদ, শনির টাইটান, বৃহস্পতির আইয়ো, ইউরোপা উপগ্রহগুলি জন্মেছে। কিন্তু ঐ যে বলয়ের পাথর টুকরোগুলো, তারা আর এক জায়গায় জড়ো হয়ে উপগ্রহ হতে পারল না! কেন? কেন তাদের উপর এ অভিশাপ?

অভিশাপ নয়। কারণ হল,—তারা যে শনির বড্ড কাছাকাছি। কোন গ্রহর খুব কাছে ভেসে বেড়ানো বস্তু পিণ্ড এক জায়গায় বেশি জড়ো হতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, বড়সর একটি উপগ্রহ যদিও বা কোনভাবে গ্রহর পেটের কাছে চলে আসে, তা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে দেবে গ্রহর আকর্ষণ শক্তি। উপগ্রহ-গুলিকে অভিকর্ষর টান দিয়ে গ্রহ ধরে রেখেছে। অভিকর্ষের টান জলময় উপগ্রহে জোয়ার ভাঁটা খেলাবে; আর যদি জল একেবারে না-ই থাকে, তাহলেও শুকনো ডাঙ্গাতে পাথরের ভাঁজে ভাঁজে টানা পোড়েন হবে। পেল্লায় একটা উপগ্রহ যদি গ্রহর বেশ কাছে কোনভাবে চলে আসে তাহলে উপগ্রহর যে দিকটা গ্রহর কাছে সেখানে যে পরিমাণ অভিকর্ষের টান পড়বে, নিশ্চয় তার থেকে উপগ্রহর দূরের অংশের উপর কম টান পড়বে। টানাটানির গরমিলে উপগ্রহ ছিঁড়ে যাবে, হবে দু' টুকরো, তার থেকে চার টুকরো। এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে উপগ্রহ ছড়িয়ে যাবে, পাব একটা বলয়!

ফরাসী জ্যোতিবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড রখ অঙ্ক কষে একটা হিসাব দিলেন। একটা উপগ্রহ নিজেকে আস্ত রেখে গ্রহর কত কাছে আসতে পারে, তার হিসাব। যে কোন উপগ্রহ, গ্রহর ব্যাসার্ধের আড়াইগুণ মাপের দূরত্বের বাইরে থাকতে হবে; তা না হলে আর রক্ষা নেই, কাছে পেলেই গ্রহ তাকে ছিঁড়ে টুকরো করে দেবে। এই দূরত্বের নাম 'রখের সীমানা।' রখের সীমানা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলে বিপদ। বিজ্ঞানীরা ঠাট্টা করে বলেছেন, রখের সীমানা খবরদার পার হবে না,

হলেই শনির দশা শুরু হবে, অর্থাৎ উপগ্রহ থেকে বলয় হতে হবে।

পৃথিবীর চারদিকে বলয় চাই ? খুব সোজা। কোনভাবে চাঁদটাকে টেনে ঘরের কাছে আনলেই সে চাঁদ ভেঙে গিয়ে বলয় তৈরি হয়ে যাবে!

আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধের আড়াইগুণের দূরত্বের মাপ ১৬০০০ কিলোমিটার। আমরা যা কিছু কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাই তারা সবাই ১৬০০০ কিলোমিটারের নিচেই থাকে। তাহলে কেন কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ভেঙে যায় না ? একটাই উত্তর—কৃত্রিম উপগ্রহগুলি তো মাপে তেমন বড়ো নয় যে তার ছ'প্রান্তে অভিকর্ষের টানে বড়ো রকম পার্থক্য হবে। তাই তারা দিব্যি অটুট থেকে মহাকাশে পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে কোন দিন যদি তেমন বড়ো চাঁদ বানাতে হয়, তাহলে অবশ্য রখের সীমানার কথা খেয়াল রাখতে হবে। নচেৎ ? শনির দশায় দফারফা!

চাঁদ যখন ডুববে না

ছোটবেলা ভাবতাম—দিনরাত আকাশে যদি চাঁদ ঝুলে থাকত তো কি মজাই না হত! কিন্তু তা কি সম্ভব? একদম অসম্ভব নয়, এখন না হোক, একদিন তো হবেই হবে। কি রকম?

পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই ঘুরে আসার পথে, চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে, তাতে কখনও সূর্যের আলো পুরোপুরি পড়ে, কখনও আধখানা কখনও সিকিখানা, কখনও বা একেবারেই পড়ে না।

যেমন, পূর্ণিমার দিন। সেদিন পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকা চাঁদের পিঠটা পুরোপুরি আলোকিত হয়—আকাশে ভাসতে থাকে একখানা আস্ত গোল চাঁদ। কিন্তু অমাবস্যার দিনে পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকা চাঁদের গায়ে একদম সূর্যের আলো পড়ে না। তাই অমাবস্যায় আমরা চাঁদ দেখতেও পাই না।

কেন চাঁদ সবসময় তার একটা দিক পৃথিবীকে দেখায়? তা হলে কি চাঁদ নিজের চারপাশে ঘুরপাক খায় না? চাঁদ কি শুধু পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে? তার নিজের কোন আবর্তন নেই?

তা নয়। আসলে, যে সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে এক পাক দেয়, ঠিক সে সময়ে সে নিজের চারদিকে একবার ঘুরে নেয়। এই সময়টা হলো—সাড়ে উনত্রিশ দিন। এর মানে, পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার দরুন চাঁদের পিঠ যতটা পৃথিবীর দিকে ফেরার কথা, ঠিক ততটা উল্টোদিকে ঘুরে যায় তার নিজের অক্ষে ঘোরার দরুন। এর জন্যে আমরা কখনই চাঁদের ওপিঠ দেখতে পাই না।

খুব সহজ একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা যাবে। ধরা যাক,

একটা গোল মাঠের মাঝে একটা আলো জ্বলছে। মাঠের চারধারে এক ব্যক্তি ঘুরছে। সে চাইছে যাতে ঐ আলো সবসময় তার মুখে পড়ে। এই আলো পেতে হলে, ঘোরার সময় তাকেও ধীরে ধীরে ঐ আলোর দিকে মুখ ঘোরাতে হবে। যদি সে মুখ না ঘোরায়, তা হলে দেখা যাবে—এক সময় মুখের সামনের আলো তার পিছনে চলে গেছে।

পৃথিবীর অনেক ঘটনার পিছনে চাঁদের সরাসরি হাত আছে। যেমন সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা। চাঁদের টানে সমুদ্রের জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে—জোয়ারের জল ভাসিয়ে দেয় উপকূল, তটরেখা, নদীতীর। শুধু জল নয়, চাঁদ পৃথিবীর কঠিন ভূত্বককেও আকর্ষণ করে। তবে জলের মতো কঠিন ভূস্তর তো ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর ভূস্তরেও সামান্য নড়াচড়া দেখা যায়। জোয়ার-ভাঁটা বা ভূস্তর কাঁপা—এসব একেবারে ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন অর্থাৎ আহ্নিক গতির উপর (যার জন্যে দিনরাত হয়) এই ঘটনা বাধা বা ব্রেকের কাজ করে। অর্থাৎ চাঁদের আকর্ষণের পরোক্ষ ফল হচ্ছে—পৃথিবী ক্রমশ তার আহ্নিক গতি হারাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তত একদিনের সময়কাল চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলেছেন যে, এক লক্ষ বছরে পৃথিবীর দিনের মাপ এক সেকেণ্ড করে বাড়ছে।

আর একটা কথা, পৃথিবীর আহ্নিক গতি কমার জন্যে চাঁদ ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চাঁদ যত দূরে যাবে, তত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে বেশি সময় লাগবে। এইভাবে এমন একদিন সময় আসবে, যখন পৃথিবী তার অক্ষে একবার ঘুরতে যে সময় নেবে, সেই সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসবে। পৃথিবীতে দিন ও মাস একাকার হয়ে যাবে। আর তখনই পৃথিবীর একদিক থেকে আকাশে সব সময় চাঁদ দেখা যাবে। চাঁদ উঠবেও না, ডুববেও না।

তবে এখনই খুশি হবার তেমন কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলেছেন, এ সব হতে এখনও অনেক অনেক দিন বাকি। ততদিন কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষের চাঁদ নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পৃথিবীর আকাশে সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। শুক্র-গ্রহর আকাশে সূর্য পশ্চিমে উঠে পূর্বে অস্ত যায়। এর কারণ, পৃথিবী নিজের চারপাশে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তিত হয় এবং শুক্রগ্রহ ঠিক উল্টোদিকে, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে।

বুধের আকাশে সূর্য কিভাবে ঘোরে ? ব্যাপারটা খুব মজার। বুধের আকাশে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, তারপর ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে পশ্চিমে এগোতে থাকে। কিন্তু পশ্চিমে অস্ত না গিয়ে সূর্য এক সময় মাঝ আকাশে থেমে যায়, তারপর উল্টোদিকে, অর্থাৎ পূর্ব দিকে চলতে শুরু করে। চলতে চলতে কিছুটা গিয়ে থেমে পড়ে। থেমে, আবার পশ্চিম দিকে পিছু হটতে হটতে শেষে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। খুব মজার ব্যাপার। এ যেন সূর্যের পাগলামি। মাঝ আকাশে একবার নেচে নিয়ে তিনি পাটে বসেন।

সব ঘটনার পিছনে কারণ থাকে। তাহলে বুধের আকাশে সূর্যের এই পাগলামির মানে কি ? সূর্য নিজে নিশ্চয়ই উল্টে পাল্টে ঘোরে না, ঘুরলে পৃথিবী থেকে আমরা তা দেখতে পেতাম।

আসলে এ সবের পিছনে বুধের ঘোরার ধরণ-ধারণই দায়ী। কিভাবে?

সব কিছু বোঝার আগে কয়েকটা জিনিস জেনে নিই। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ এই বুধ। বুধ আকারেও খুব ছোট, এমনকি পৃথিবীর থেকেও। আর সব গ্রহের মতো বুধ উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারপাশে 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে' আবর্তন করে। বুধ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে (অনুসূর বিন্দু) তখন বুধ ও সূর্যের দূরত্ব মাত্র ৪৬,০০০,০০০ কিলোমিটার। সূর্য ও বুধের দূরতম দূরত্ব (অপসূর বিন্দু) ৬৯,৮০০,০০০ কিলোমিটার। দূরত্ব দুটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে উপ-বৃত্তাকার পথটি খুবই লম্বাটে ধরণের, চওড়া দিকটা মোটেই বেশি নয় উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus) সূর্য বিরাজমান।

সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে বুধের ৮৮ দিন (১ দিন=২৪ ঘণ্টা) সময় লাগে। শুধু সূর্যের চারপাশে নয়, বুধ নিজ অক্ষের চারপাশে 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে' ঘোরে। একে আমরা আহ্নিক গতি বলি। আমাদের পৃথিবীরও আহ্নিক গতি আছে। আহ্নিক গতির জন্য দিন রাত হয়। বুধ খুব আস্তে আস্তে নিজের চারপাশে ঘোরে। নিজের চার-পাশে একবার ঘুরতে বুধের ১৭৬ দিন সময় চলে যায়। তার অর্থ, বুধের একদিন, পৃথিবীর ১৭৬ দিনের সমান। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো—৮৮-এর দ্বিগুণ ১৭৬। এর মানে, বুধের একটি দিন শেষ হতে তার দু-দুটি বছর সময় চলে যায়। কত বড়ো দিন!

বেশ, তাহলে এটা পরিষ্কার যে দিনের বেলায় বুধ সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে, তারপর রাতে আর একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে বুধ একবার সূর্যের খুব কাছে আসে, একবার খুব দূরে সরে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন যে—বুধ যখন সূর্যের কাছাকাছি আসে, তখনই তার আকাশে সূর্যের উল্টোদিকে ঘোরা শুরু হয়। কিন্তু কেন? এই রহস্যের চাবিকাঠি আছে বুধের কক্ষপথের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

কোন বস্তুর আবর্তন গতি থাকলেই 'কৌণিক গতিবেগ' থাকবে। প্রথমেই, কৌণিক গতিবেগ বলতে কি বোঝায়, তা বুঝে নেওয়া দরকার।

ধরা যাক্, ঘড়ির কাঁটা। বাড়ির দেয়ালের বড় ঘড়ির দিকে দেখলে দেখব, ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটি ১২টার স্থান থেকে ৩টার স্থানে আসতে পনেরো মিনিট সময় নেবে। মিনিটের কাঁটার এই দুই অবস্থানের মধ্যে ৯০° কোণ থাকে। তাহলে, এক মিনিটে কাঁটাটি ৯০°÷১৫=৬° কোণ আবর্তন করে। অতএব, মিনিটের কাঁটার কৌণিক গতিবেগ — প্রতি মিনিটে ৬°।

সূর্যের চারদিকে আবর্তন করার জন্যও বুধের কৌণিক গতিবেগ আছে। একে আমরা 'বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ' বলি। প্রতিদিন সূর্য-কেন্দ্রে যত ডিগ্রী কোণ বুধ গ্রহ আবর্তন করে তাকে তার বার্ষিক

কৌণিক গতিবেগ বলা হয়। বুধের বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ সারা-বছর স্থির থাকে না, কমে বাড়ে। যখন বুধ সূর্যের কাছাকাছি থাকে তখন তার বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ বেশি হয়ে যায়। অত্যন্ত লম্বাটে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমা করতে করতে বুধ যখন সূর্যের নিকটে আসে তখন বুধ দ্রুত সূর্য-কেন্দ্রে ১৮০° কোণ অতিক্রম করে। অনুসূর বিন্দুর মধ্য দিয়ে বুধ তাড়াতাড়ি চলে যায়। তাই অনুসূর বিন্দুর নিকটস্থ বুধের 'বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ' বেশি। আবার বুধ যখন সূর্য থেকে দূরে দূরে থাকে তখন তার বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ কম হয়। অপসূর বিন্দু অতিক্রম করার সময় বুধ ধীরে ধীরে সূর্য-কেন্দ্রে ১৮০° কোণ অতিক্রম করে।

নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরার জন্য বুধে আর একটি কৌণিক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এর নাম 'আহ্নিক কৌণিক গতিবেগ'। বুধ সারাবছর একই গতিতে নিজের চারপাশে পাক দেয়। তাই তার আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের মান সব সময় সমান।

বুধের দুই কৌণিক গতিবেগের মধ্যে বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ বাড়ে ও কমে, কিন্তু আহ্নিক কৌণিক গতিবেগ স্থির। দুই কৌণিক গতি-বেগের কারণে বুধের আকাশে সূর্য পরিভ্রমণ কেমন দেখাবে, তা নির্ভর করে কৌণিক গতিবেগ দুটির পারস্পারিক সম্পর্কের উপর।

ধরা যাক্, বুধ গ্রহে দাঁড়িয়ে কোন দর্শক সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করছে। দর্শক দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, দক্ষিণের আকাশে সূর্য। দর্শকের বামে পূর্ব দিক, ডান দিকে পশ্চিম ও পিছনে উত্তর দিক। বুধ গ্রহ নিজ অক্ষে 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে' অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তিত হচ্ছে। এর জন্য দর্শক সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যেতে দেখবে। একই সঙ্গে বুধ 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে' সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর জন্য, দর্শকের বাম দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত যে প্রসারিত রেখা, সেই রেখা বরাবর বুধ বাম দিক থেকে ডান দিকে এগিয়ে চলেছে। তার ফলে, দর্শক সূর্যকে আকাশের ডান দিক থেকে বাম দিকে সরে যেতে দেখবে।

মোট ফল এই যে, বুধের আহ্নিক আবর্তনের জন্য দর্শক সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা বাম দিক থেকে ডান দিকে সরতে দেখবে এবং বার্ষিক আবর্তনের জন্য সূর্যকে ডান দিক থেকে বাম দিকে সরতে দেখবে। অন্য ভাষায়, বুধের আহ্নিক গতির জন্য সূর্যকে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে ঘুরতে দেখা যাবে এবং বার্ষিক আবর্তনের জন্য সূর্যকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে যেতে দেখা যাবে। একই সঙ্গে বুধের দুটি গতি থাকার জন্য,যে গতির কৌণিক গতিবেগ অন্যটির থেকে বেশি হবে, তার দ্বারা নির্দিষ্ট অভিমুখে সূর্যকে চলতে দেখা যাবে।

যখন বুধের আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের মান বার্ষিক কৌণিক গতিবেগের থেকে বেশি হবে, তখন আকাশে সূর্যকে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বা পশ্চিম দিকে চলতে দেখা যাবে। আবার যখন বুধের বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের থেকে বেশি হবে, তখন সূর্যকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে বা পূর্ব দিকে চলতে হবে। যখন দুই কৌণিক গতিবেগ সমান হবে, তখন সূর্যকে আকাশে স্থির দেখাবে।

এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, বুধের আকাশে সূর্যের পাগলামির উৎস কোথায়। সূর্যের চারদিকে চলতে চলতে একসময় বুধের বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ, আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের থেকে কম থাকে—তখন সূর্য পশ্চিমে চলে। তারপর বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ বাড়তে বাড়তে যখন আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের সমান হয়, তখন আকাশে সূর্যকে স্থির দেখায়। তারপর, বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ, আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের থেকে বেশি হয়ে যায়, আর সূর্য পশ্চিম থেকে পূর্বে চলতে শুরু করে। বার্ষিক কৌণিক গতিবেগের মান সর্বোচ্চ হবার পর কমতে শুরু করে। কমতে কমতে যখন তা আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের সমান হয়, আকাশেও সূর্য পূর্ব দিকে হাঁটা বন্ধ করে স্থির হয়ে পড়ে। বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ এর পর আরো কমে যখন আহ্নিক কৌণিক গতিবেগের নিচে চলে যায়, সূর্যও পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে যেতে শেষে অস্তাচলে হারিয়ে যায়।

তবে একটা দুঃখ থাকে। হায়, এমন মজার সূর্যের খেলা দেখার দর্শক বুধে যে নেই!

পেটমোটা পৃথিবী

পৃথিবী গোল, একটি আস্ত গোলক। কত বড় এই পৃথিবী? কতই বা তার ব্যাস ব্যাসার্ধ পরিধি? উত্তরের জন্য আমরা চট্‌পট্‌ 'জানা-অজানা' বই খুলে ফেলি। কিন্তু যে যুগে কোন বই-এ উত্তর লেখা ছিল না, বিজ্ঞানীদের দপ্তরেও খবর জানা ছিল না, তখন পৃথিবীর মাপ জানাটা কত কঠিন ছিল, বিষয়টাই ছিল রীতিমতো গবেষণার।

আজ থেকে অনেকদিন আগেকার কথা। যীশুর জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগে, গ্রীসদেশের এক পণ্ডিত এরাটোস্‌থেনেসের মাথায় এলো—কি করে পৃথিবীর ব্যাস মাপা যায়। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। বিন্দুমাত্র কুঁড়েমি না করে এরাটোস্‌থেনেস মানচিত্র নিয়ে বসলেন। খুঁজে বের করলেন দুটি জায়গা—একটি সাইইন নামের শহর, যা কর্কটক্রান্তি রেখার উপর অবস্থিত, অন্যটি তার থেকে পাঁচশ মাইল দূরের সহর আলেকজান্দ্রিয়া। এরাটোস্‌থেনেস জানতেন যে ২১শে জুন ভরদুপুরে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর বা সাইইন শহরে লম্বভাবে কিরণ দেবে। ঐ দিনই তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে বসে, সূর্য কত ডিগ্রী কোণ করে সেখানে আলো দিচ্ছে, তা মাপলেন। এই মাপজোকটা তেমন শক্ত নয়। দাঁড় করানো একটা খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে এই কোণ মাপা যায়। কোণের মাপ ও দুই শহরের দূরত্ব থেকে সহজেই পৃথিবীর বক্রতার হিসাব বের করলেন এরাটোস্‌থেনেস। বক্রতার মাপ থেকে এবার অঙ্ক কষে তিনি বললেন, পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইল এবং তার পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। কত নিখুঁত এই হিসাব! আজ আমরা উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে দেখেছি —সত্যি এই দুটি মাপ প্রায় ঠিক আছে।

'প্রায়' বলছি কেন ? কারণ পৃথিবী ঠিক ঠিক গোল নয়। মহাকাশ থেকে দেখলে অবশ্য পৃথিবীর গোলে ভেজাল আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত। মেরু দুটি একটু চাপা, বিষুবরেখার দিকটা একটু বেশি মোটা। কিভাবে তা জানা গেল ? সে ইতিহাসটাও বেশ মজার।

তখন নিউটন বেঁচে। মাধ্যাকর্ষণ বল নিয়ে গবেষণা করছেন, চিন্তাভাবনা চলছে অপকেন্দ্রিক ও অভিকেন্দ্রিক বলের প্রকৃতি নিয়ে। নিজের অক্ষের উপর ঘুরপাক খাওয়া পৃথিবীর কি দশা হতে পারে ? আহ্নিক ঘূর্ণনের জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় কৌণিক গতিবেগ সমান হলেও রৈখিক গতিবেগ সমান নয়। মেরু অঞ্চল যত জোরে আবর্তিত হচ্ছে, বিষুবরেখার উপরের অঞ্চলগুলি তার থেকে ঢের জোরে ,ঘুরছে। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ে বিষুবরেখার উপরের কোন বিন্দু—মোট বিষুবরেখার দূরত্ব, অর্থাৎ ২৫০০০ মাইল পথ পার হবে ; কিন্তু ঐ একই সময়ে মেরু-বিন্দু দুটি মোটেই নড়বে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কলম্বো শহর যেখানে এক ঘণ্টায় ১০০০ মাইল চক্কর দেয়, সেখানে লণ্ডন শহর অতিক্রম করে মাত্র ৬৫০ মাইল পথ !

পৃথিবীর যে জায়গায় গতিবেগ বেশি সেখানে অপকেন্দ্রিক বলের প্রভাবও বেশি। অপকেন্দ্রিক বল ভূত্বককে বাইরের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। সেটাই অপকেন্দ্রিক বলের প্রকৃতি, আর এই অপচেষ্টাকে বাধা দেয় অভিকেন্দ্রিক বল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বিষুবরেখা অঞ্চলে অপকেন্দ্রিক বল বেশি, তাই বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর তল কিছুটা ফেঁপে ঠেলে বেরিয়ে এলো। আবার মেরুতে তুলনামূলকভাবে অপ-কেন্দ্রিক বল কম, তাই মেরুদুটি কিছুটা চাপা। এককথায়, উত্তর দক্ষিণ মেরু চাপা, বিষুবরেখায় স্ফীত পেটমোটা পৃথিবী—ঠিক যেন একটা কমলালেবু !

কিন্তু মুস্কিল হল, পৃথিবীর আকার নিয়ে নিউটনের এই কল্পনার প্রমাণ কোথায় ? কে দেখেছে আস্ত পৃথিবী যে সে হলফ নিয়ে বলবে

—ঠিক, পৃথিবী একটু পেটমোটাই বটে! তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যা অবস্থা ছিল—তা দিয়ে পৃথিবীকে মাপামাপি সম্ভব ছিল না। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মেপে দেখা গেছে, নিউটনের কথাই ঠিক। দুই মেরু যোগ করে পৃথিবীর যে ব্যাস তার মাপ ৭৮৯৯ মাইল এবং বিষুবরেখাভেদী পৃথিবীর ব্যাসের মাপ ৭৯২৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পেটটা প্রায় ২৭ মাইলের মতো মোটা।

সেকালে পৃথিবীর ব্যাস সরাসরি মাপা না গেলেও—অন্যভাবে তা জানার চেষ্টা হয়েছিল। পৃথিবীর নানা জায়গায় পেণ্ডুলাম দোলানো হয়েছিল, দোলন-কালের ব্যতিক্রম দেখে বোঝা গেল যে বিষুবরেখাতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তুলনামূলকভাবে বেশি।

যাই হোক, একটু চাপা-একটু মোটা পৃথিবী নিয়ে যা যা বললাম, তাই-ই যদি শেষ কথা হত, আমরা আশ্চর্য হতাম না। বলতাম, অপকেন্দ্রিক বলের প্রভাবে আর পাঁচটা গ্রহর মত পৃথিবীর এদশা হয়েছে। বৃহস্পতি ও শনি গ্রহরও তো ওই এক দশা। কিন্তু খুব অল্প দিন হল, পৃথিবীর আকার নিয়ে নতুন কিছু শোনা যাচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে পাঠাবার পর আরো কতগুলি কথা জানলাম।

নিখুঁত ম্যাপ তৈরি করা সব সময়ই একটা সমস্যা। বিশেষ করে মহাসাগরে ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট দ্বীপের ম্যাপ আঁকতে গেলে উপগ্রহর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যে 'ভ্যানগার্ড-১' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাল। দীর্ঘকাল ঘোরাফেরার পর 'ভ্যানগার্ড-১' জানাল যে পৃথিবী যে বিষুবরেখা বরাবর পেটমোটা, তা-ও সর্বত্র সমান নয়। বিষুবরেখার দক্ষিণে কোন কোন অংশ প্রায় পঁচিশ ফুটের মত বেশি উঁচু। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ দ্রাঘিমায়, বিষুবরেখার দুপাশে পৃথিবী দুভাবে ফুলে আছে। দক্ষিণটা উত্তরের তুলনায় বেশি উঁচু, উত্তরটা তোবড়ানো! এই যে পৃথিবীর হঠাৎ করে কোন কোন

জায়গায় এবড়ো-খেবড়ো ভাবটা, তা একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ দেখলেই বোঝা যায়, এমনিতে নয়।

বিষুবরেখার দু-পাশে দু-রকম ফোলাটাই যে কেবল ব্যতিক্রম তা নয়। আরো দেখা গেছে, উত্তর মেরুর তুলনায় দক্ষিণ মেরু প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ মেরু কাছে, উত্তর মেরু দূরে। এ-ও খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ অজ্ঞাত।

শুধু কি এই? বিষুবরেখাও একটি নিখুঁত বৃত্ত নয়। কোন কোন স্থানে বিষুবরেখা একটু বেশি মাত্রায় বাঁকা। স্থান বিশেষে বিষুবরেখার ব্যাস মূল ব্যাসের থেকে প্রায় ১৪০০ ফুট বেশি।

আধুনিক যন্ত্রপাতি বলছে, পৃথিবী গোল—তা প্রায় ঠিক, কমলা-লেবুর মত গোল বলা আরো ঠিক, পেটমোটা তোবড়ানো পৃথিবী বলাটা প্রায় সত্য ভাষণের কাছাকাছি। প্রকৃতির হাতের কাজ তো মানুষের মন রেখে হয় না—নানান ধরণের শক্তি ও বলের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে প্রকৃতি যা করে, তাই-ই সত্য। আর সেই সত্যকে খুঁজে বেড়ায় বিজ্ঞান।

জানি না, আগামী দিনে আরো উন্নত বিজ্ঞান পৃথিবীর চেহারার আর কি কি খুঁত বের করবে। যতই খুঁতো হোক তবু আমাদের এই পেটমোটা পৃথিবী আমাদের আদরের, আমাদের ভালবাসার ধন।

মহাকাশের ডাস্টবিন

যত সব আবর্জনা তাদের জায়গা কোথায়? ডাস্টবিনে, আঁস্তাকুড়ে। মহাকাশও কত আবর্জনায় ভরা। ছন্নছাড়া উল্কা, ধুলো, গ্যাস, মানুষের পরিত্যক্ত মহাকাশযান—এমন কত কি মহাকাশের বুকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়। তবে, তারা চিরকাল ভেসে বেড়ায় না, তাদেরও একসময় এক জায়গায় ঠাঁই হয়, ঠাঁই হয় মহাকাশের ডাস্টবিনে।

সে অনেকদিন আগের কথা। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অঙ্কবিদ লুসেফ লুই ল্যাগ্রাঁজে অঙ্ক কষে বলেছিলেন,—কোথায় কোথায় ঐ ডাস্টবিনগুলো আছে। তার অনেক পরে জ্যোতিবিদরা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে ডাস্টবিনগুলো ঘাঁটিতে লাগলেন—যদি কিছু অমূল্য সম্পদ পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, পাওয়া গেল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃহস্পতির লাগোয়া দুটি ডাস্টবিনে পাওয়া গেল খুদে খুদে পাথরের চাঁই—গ্রহভাঙ্গা টুকরো। এরা আদতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যাঞ্চলের 'গ্রহাণুপুঞ্জের' অংশ, একই জাত। ট্রয় যুদ্ধের নামী বীরদের নামে এদের নামকরণ হল, একজনের নাম হল 'অ্যাকিলিস'। এই সব খুদে খুদে গ্রহাণুপুঞ্জদের আজকাল আমরা এক কথায় বলি 'ট্রোজান গ্রহপিণ্ড'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মহাকাশের আবর্জনা ঐ ডাস্টবিনগুলোয় জড়ো হয় কেন? যখন সত্যি সত্যিই কেউ ডাস্টবিন বানায়নি, তখন কেনই বা অকেজো হাবিজাবি জিনিসগুলি একটি বিশেষ স্থানে দানা বাঁধে?

ধরা যাক্, পৃথিবী ও চাঁদ—এই গ্রহ উপগ্রহর কথা। চাঁদ একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৃথিবীকে আবর্তন করে চলেছে। ল্যাগ্রাঁজে হিসাব করে বললেন যে চাঁদের কক্ষপথের উপর এমন দুটি স্থান আছে, যেখানে কোন

বস্তুকে রাখলে তা পৃথিবী বা চাঁদ কেউই আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনেআনতে পারবে না। অর্থাৎ, ঐ বস্তু চিরকাল সাম্যাবস্থায় ঐ স্থানেই থেকে যাবে। চাঁদ যেমন যেমন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, ঐ বস্তুও চন্দ্র-কক্ষ পথ ধরে তেমন ঘুরে যাবে, চাঁদ যে অভিমুখে যত ডিগ্রী ঘুরবে, বস্তুটিও ঠিক সেই দিকে তত ডিগ্রী ঘুরে যাবে। চাঁদ বা পৃথিবী থেকে ঐ বস্তুর দূরত্ব সব সময় একই থাকবে, পরিবর্তন হবে না। চাঁদ বা পৃথিবীর সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান স্থির।

চন্দ্র-কক্ষপথে কোথায় থাকবে ঐ বস্তুখণ্ড ? চাঁদ, পৃথিবী ও বস্তুখণ্ড পরস্পরের সঙ্গে ৬০° কোণ করে থাকবে। অন্য কথায়, চাঁদ, পৃথিবী ও বস্তুখণ্ড এই তিনে মিলে যে ত্রিভুজ হবে, তা একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

বলাবাহুল্য চন্দ্র-কক্ষপথে এরকম যে দুটি স্থান পাওয়া যাবে। এদের আমরা ল্যাগ্রাঁজের চতুর্থ, পঞ্চম বা 'L4, L5' বিন্দু বলি।

অতএব, ল্যাগ্রাঁজের চতুর্থ বা পঞ্চম বিন্দুতে কোন মহাকাশযান স্থাপন করলে তা পৃথিবী ও চাঁদ থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চিরকাল পৃথিবীকে পরিক্রমা করবে। পৃথিবী ও চাঁদের টানাটানির মাঝে সে নিজের নিশ্চিন্ত স্থান করে নেবে। অক্ষয় হবে তার অবস্থান। মহাকাশে বসবাস করতে হলে বসত বাড়ির ঠিকানা ঐ ল্যাগ্রাঁজের চতুর্থ বা পঞ্চম বিন্দু হওয়াই ভালো।

পৃথিবীর চারপাশে যেমন দুটি ল্যাগ্রাঁজে-বিন্দু আছে, তেমনি সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথে দুটি ল্যাগ্রাঁজে-বিন্দু থাকবে। অর্থাৎ, যে কোন ঘূর্ণ্যমান বস্তুর আবদ্ধ পথে দুটি ল্যাগ্রাঁজে-বিন্দু পাওয়া যাবে, যেখানে কোন বস্তু অবস্থান করলে তা গ্রহ-উপগ্রহ – সূর্যের টানা-পোড়েনের মাঝে ঠিক ঠিক ঘুরে চলবে।

ইদানীং মহাকাশে কলোনী বানাবার কথা উঠছে। কলোনী কৃত্রিম বাসস্থান—যেখানে সাময়িকভাবে পৃথিবীর বাসিন্দারা মহাকাশ অভিযানের সময় বিশ্রাম নেবে, যেখান থেকে মহাকাশের আরো গভীরে অভিযান হবে, যেখান থেকে মহাকাশের পর্যবেক্ষণ হবে সহজ সরল।

কোথায় বানাবো এই কলোনী, কোথায় সেই নিরাপদ স্থান ? কোথায় সেই স্থিতিশীল জায়গা ?

সেই প্রার্থিত জায়গা পেতে হলে ল্যাগ্রাঁজের শরণাপন্ন হতে হয়। পৃথিবী থেকে বেরিয়ে কোথাও যদি কলোনী করতেই হয় তবে তার অবস্থান চন্দ্র-কক্ষপথের উপর হওয়াই ভালো। চন্দ্র-কক্ষপথে এরকম তুটি স্থান আছে। পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূরে, চাঁদ থেকে ঠিক ততটা দূরেই অবস্থিত ঐ তুটি বিন্দু, অবশ্য তারা চাঁদের পৃথিবী-পরিক্রমা পথের উপর অবস্থিত। যেহেতু পৃথিবী-চন্দ্র ও চন্দ্র-ল্যাগ্রাঁজের বিন্দুর দূরত্ব সমান, তাই চন্দ্র-পৃথিবী ও ল্যাগ্রাঁজে বিন্দু একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে অবস্থান করছে।

চাঁদের কক্ষপথের উপর যে ল্যাগ্রাঁজের চতুর্থ ও পঞ্চম বিন্দু আছে তাতে গ্রহখণ্ড নেই বটে, তবে মহাকাশের ধুলো ও গ্যাস যে সেখানে ইতিমধ্যে জড়ো হয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। ওদের হটিয়ে দিয়ে মহাকাশযান বসানোর তোড়জোড় চলছে।

এ ব্যাপারে শুধু যে বিজ্ঞানীরাই উৎসাহী তা নয় ; সাধারণ বিজ্ঞান পাঠক, কৌতূহলী সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী—সবাই ল্যাগ্রাঁজের চতুর্থ ও পঞ্চম বিন্দু নিয়ে কল্পনার জাল বুনছে। বিদেশে, এমনকি L5-সংস্থা, L5-পত্রিকা, L5-ক্লাবও তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে তেমন উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ছে না। দেখা যাক এর পর কি হয়।

মহাকাশের ছুনিয়ায় সবাই ঘুরে মরছে। পৃথিবী ঘুরছে, চাঁদ ঘুরছে, সূর্য ঘুরছে, মঙ্গল শুক্ররা ঘুরছে, নীহারিকা ঘুরছে, গোটা তারাজগত ঘুরছে। সবাই. সবাই নিজের নিজের কল্পিত অক্ষরেখার চারপাশে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে, ঠিক যেন এক একটা ঘুরন্ত লাটিম।

কেন? কেন এরা ঘুরছে, ঘুরবে? কে তাদের ঘুরিয়ে দিয়েছে? এমন জাতের প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও এই প্রশ্নর কোন সঠিক জবাব নেই। একেবারেই নেই তা নয়, অনেক খুঁজে পেতে মোটামুটি একটা জবাব দেওয়া যেতে পারে।

মহাকাশের সবার জন্ম হয়েছিল এক আদি মেঘমণ্ডলের মধ্যে। সেই মেঘমণ্ডলও সেই অতীতকালে ঘুরছিল, জোরেই ঘুরছিল। যখন মেঘ থেকে গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাদের জন্ম হল, তখন 'কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণের' নিয়ম মেনে সেই আদি ঘূর্ণন ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাতে।. আদি পুরুষের দোষ গুণ যেন ভাগ করে দেওয়া হল বংশধরদের মধ্যে। আদিতে যা কৌণিক ভরবেগ ছিল, পরবর্তীকালে বিভক্ত খণ্ডদের মোট কৌণিক ভরবেগ তার সঙ্গে সমান। কোন ঘুরন্ত বস্তুর ভর, ঘূর্ণন গতিবেগ ও বস্তুর ব্যাসার্দ্ধ—এই তিনের গুণফলকে 'কৌণিক ভরবেগ' বলে। এভাবে সেই অতীতের জের হিসাবে মহাকাশের সব বস্তু ঘুরছে। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়—আদি মেঘ-মণ্ডলে ঘূর্ণন এল কি করে? সে প্রশ্নের জবাব নেই।

পৃথিবীও তার অক্ষরেখার চারদিকে ঘুরছে, ফলে দিন রাত সম্ভব হয়েছে। সূর্যও তার অক্ষরেখার চারদিকে ঘুরছে—যার জন্য সৌর-কলঙ্ক সূর্যের থালার উপর নড়ে চড়ে। মঙ্গল, শুক্র, বুধ—তাদেরও দিন

আছে, রাত আছে। এদের কথা এখন থাক। বরং চাঁদ এবং তার ঘোরাফেরা নিয়ে একটু আলোচনা করি, কারণ ঐ বিষয়েও চাঁদ বেশ অনন্য।

চাঁদ নিজ অক্ষের চারদিকে বেশ আস্তে আস্তে ঘোরে। এভাবে একপাক ঘুরতে প্রায় একমাস সময় চলে যায়। হিসাব করলে দেখবো, যে সময়ে চাঁদ এক পাক ঘুরে নিচ্ছে, ততক্ষণে তার একবার পৃথিবীকে পরিক্রমা করাও হয়ে গেছে। এর ফলে, চাঁদের এক পিঠ সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো, অন্য পিঠ আর পৃথিবী-মুখো হয় না। আমরা সব সময় চাঁদের একটি পিঠ দেখি। সোভিয়েট মহাকাশযান চাঁদের ও-পিঠে গিয়ে ছবি তুলে আনবার পরই আমরা চাঁদের অদৃশ্য পিঠ সম্পর্কে জানতে পারি। ছবিটা এমন কিছু আহামরি অন্যরকম নয়, প্রায় দৃশ্য চন্দ্র-পৃষ্ঠের মতো। চাঁদ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে, আর ঐ সময়ের মধ্যেই সে নিজে অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে নেয়।

আমরা বলছি, পৃথিবী থেকে চাঁদের আধখানা দেখা যায়, বাকি আধখানা দেখা যায় না। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। সত্যি বলতে কি, আমরা চাঁদের আধখানার চেয়ে বেশিই দেখি। চন্দ্রপৃষ্ঠের শতকরা ৫৯ ভাগ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান, বাকি ৪১ ভাগ অদৃশ্য। কি করে তা সম্ভব?

সম্ভব এই কারণেই যে, চাঁদের ঘূর্ণন বেশ জটিল প্রকৃতির। পৃথিবীর অক্ষরেখা ২৩$\frac{1}{2}$° কোণ করে পৃথিবীর সূর্য আবর্তন-তলের লম্বর থেকে বেঁকে আছে। পৃথিবী হেলানো বলে পৃথিবীতে ঋতুবৈচিত্র দেখা যায়, শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্তে কত তফাৎ।

আবার চাঁদের অক্ষরেখাও, চাঁদ যে তলে পৃথিবীকে আবর্তন করছে, তার লম্বর সঙ্গে ৬$\frac{1}{2}$° কোণে হেলে আছে। যদি এই অক্ষরেখাটি ঐ তলের উপর লম্বভাবে থাকত, তবে অক্ষরেখা চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে চাঁদের যে দু-টুকরো করত, তার এক টুকরো আমরা

পৃথিবী থেকে দেখতে পেতাম, অন্য টুকরোকে নয়। কিন্তু ৬$\frac{1}{2}$° হেলে থাকার জন্য কি হচ্ছে? যখন চাঁদের উত্তর মেরু পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে থাকে তখন পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের উত্তর মেরু তো দেখছিই, তার সঙ্গে উত্তর মেরুর ওপাশের তথাকথিত অদৃশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠেরও কিছুটা দেখতে পাচ্ছি!

এরপর, চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে যখন তার কক্ষপথের বিপরীত দিকে পৌঁছাবে তখন তার দক্ষিণ মেরুটি পৃথিবীর দিকে উঁচিয়ে থাকবে। এই অবস্থায় আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের দক্ষিণ মেরু ও তার ওপারের অদৃশ্য পিঠের কিছুটা দেখতে পাব। এক কথায়, সাড়ে উনত্রিশ দিনের মধ্যে চাঁদের অর্ধাংশের বেশিই আমাদের চোখে পড়বে।

একটা উদাহরণ দিই। পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করছে। ধরা যাক, সূর্যে বসে কোন দর্শক পৃথিবীকে দেখছে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, গোটা উত্তর মেরুতে তখন দিন, সূর্য থেকে উত্তর মেরু সমেত 'ওপারের' গোলার্ধের কিছুটা দেখা যাবে। তেমনি উত্তর গোলার্ধের শীতকালে দক্ষিণ মেরু সমেত 'ওপারের' গোলার্ধের কিছু অংশকে সূর্য থেকে দেখা যাবে।

তবে, একমাত্র একটি কারণেই যে চন্দ্রপৃষ্ঠের শতকরা ৫৯ ভাগ আমরা দেখি—তা নয়। চাঁদ একটি উপবৃত্তের পথ ধরে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে গিয়ে চাঁদ প্রতিদিন যত ডিগ্রী কোণ করে ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক তত ডিগ্রীই আপন কক্ষপথে ঘুরে যাওয়ার কথা (না হলে পৃথিবীর দিকে চাঁদের এক মুখ ফেরানো হতে পারে না)। চাঁদের আপন কক্ষে ঘূর্ণনের হার একরকম থাকলেও, পৃথিবী-পরিক্রমার হার সব সময় সমান নয়, পরিবর্তনশীল। উপবৃত্তের পথে ভ্রাম্যমাণ কোন বস্তুর 'বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ' সমান থাকে না। বার্ষিক কৌণিক গতিবেগ ও আহ্নিক কৌণিক গতিবেগ সমান না হবার ফল?

সাড়ে উনত্রিশ দিনের প্রথম অংশে আমরা চাঁদের পূর্ব প্রান্তের পিছনের কিছু অংশ এবং শেষের দিকে পশ্চিম প্রান্তের পিছনের আরো

কিছু অংশ দেখতে পাই। বিশেষ বিশেষ সময়ে চাঁদ তার কক্ষপথে যত ডিগ্রী ঘুরে যায়, ঠিক তত ডিগ্রী কোণে অক্ষরেখাকে আবর্তন করে না। এমন গরমিলের জন্য আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রত্যাশিত অংশ অপেক্ষা আরো বেশ খানিকটা জায়গা চোখে দেখি।

আরও একটি কারণ আছে। পৃথিবী তার অক্ষরেখার চতুপার্শ্বে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরে যায় (যেজন্য আমরা পৃথিবীর আকাশে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি)। সন্ধ্যাবেলায় কোন দর্শক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যে চাঁদ দেখছে, সে যখন আবার শেষ রাতে ঐ চাঁদ দেখে তখন এই দুই 'দেখার' মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ঘটে যায়। এই সময়ের ব্যবধানের মধ্যে পৃথিবী ও দর্শক অনেকটা ঘুরে গেছে। দুটি ভিন্ন স্থানে দর্শকের অবস্থানের দরুণ, সন্ধ্যাবেলা চাঁদের পশ্চিম প্রান্তের পশ্চাতের কিছুটা আর শেষ রাতে চাঁদের পূর্ব প্রান্তের পশ্চাতের কিছু জমি আমাদের দৃষ্টিতে আসে।

ঘরের কাছে যে চাঁদ, তাতে এতো মজা আছে এ কথা কে জানত ? শুধু চাঁদে কেন, অন্য গ্রহ উপগ্রহর চালচলনে আরো অন্য রকমের মজা আছে। পরে সে সব আলোচনা করা যাবে।

ইউরেনাস গ্রহ একটা ব্যাপারে আর পাঁচটা গ্রহর থেকে একেবারে আলাদা—ইউরেনাস তার আবর্তন তলে প্রায় শুয়ে আছে। ইউরেনাসের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে যে অক্ষরেখা গেছে, যে অক্ষরেখার চারদিকে ইউরেনাস ঘুরছে, সেই অক্ষরেখাটি তার সূর্য-আবর্তন তলে পাতা আছে। অর্থাৎ, অক্ষরেখাকে বাড়িয়ে দিলে শেষে সূর্যকেই তা ভেদ করে যাবে। তার ফল?

তার ফলে, ইউরেনাসের গোটা উত্তর গোলার্ধ একটানা একুশ বছর সূর্যের মুখ দেখবে, দিন চলবে একুশ বছর একনাগাড়ে। আবার একুশ বছর ধরে উত্তর গোলার্ধ নিরবিছিন্ন রাতের মধ্য দিয়ে সময় কাটাবে। অনেকটা আমাদের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর একটানা ছ'মাস নৈশ-যাপন বা ছ'মাস দিনযাপনের মত। তবে ইউরেনাসের বেলায় সময়টা বড়, কারণ ইউরেনাস চুরাশি বছরে সূর্যকে একবার ঘুরে আসে। ইউরেনাসের 'এক বছর' আমাদের পৃথিবীর এক বছরের চুরাশিগুণ!

আর একটা ব্যাপারে ইউরেনাস ইদানীং বিজ্ঞানীকূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি জানা গেছে যে ইউরেনাসেরও বলয় আছে। আবিষ্কার পর্বটি বেশ মজার।

অঙ্ক কষে দেখা গেল যে, ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে দূরের একটি নক্ষত্রর আলোর যাত্রাপথে ইউরেনাস কিছু সময়ের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। নক্ষত্রটির আলো সোজা পৃথিবীতে এলে আমরা সেই আলোর পথ ধরে নক্ষত্রটিকে দেখি। ঐ আলোর পথে যদি হঠাৎ ইউরেনাস হাজির হয়, তাহলে ইউরেনাসকেই দেখবো, নক্ষত্র নয়। এ-ও একরকমের 'গ্রহণ'।

এরকম একটা ঘটনা ১৯৭৭ সালে ঘটেছিল। ঐ তথাকথিত গ্রহণের সুযোগে ইউরেনাসের বাতাসের ঘনত্ব, উপাদান ইত্যাদি জানা সম্ভব, এ ছাড়া গ্রহটা কত চওড়া, তা-ও মাপা যায়। এই সব ভেবে, সে বছর পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রটির 'গ্রহণ' দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মুস্কিল হয়েছিল যে, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে 'গ্রহণ' দেখা সম্ভব ছিল না, একমাত্র দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়াতেই 'গ্রহণ' দেখা যেত।

অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম প্রান্তে পার্থ শহরের মানমন্দিরে সব ব্যবস্থা হল। মেঘ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ-দর্শন বিপর্যস্ত হতে পারে ভেবে বিজ্ঞানীরা একচল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে উড়ন্ত একটি বিমানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখলেন। মেঘমুক্ত ধূলিমুক্ত উচ্চাকাশ থেকে পরিষ্কার ইউরেনাস ও বিশেষ নক্ষত্রটি দেখা যাচ্ছিল। একটি জটিল যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্র থেকে ভেসে আসা আলোর মাপ নেওয়া হচ্ছিল। তখনও 'গ্রহণ' হতে কিছুটা সময় বাকি। হঠাৎ দেখা গেল যে নক্ষত্র থেকে আসা আলোর পরিমাণ কমে গেল, তার পরক্ষণেই আবার বাড়ল। এইভাবে পর পর পাঁচবার আলোর হ্রাসবৃদ্ধির পর আলোর আগমন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল ইউরেনাসের আড়ালে নক্ষত্রের আত্মগোপনের সময়। পঁচিশ মিনিটের 'গ্রহণের' পর আবার নক্ষত্রটিকে চোখে দেখা গেল। তারপর বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়ে আবার শুরু হল পর পর পাঁচবারের অলোর বৃদ্ধি ও হ্রাস। আবার সেই হঠাৎ আলো বাড়া, হঠাৎ আলো কমা। সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—কেন, কি জন্য, নক্ষত্রর আলো এভাবে একবার বাড়ছে, একবার কমছে। তবে কি কেউ নক্ষত্রের আলোর পথে বাধা দিচ্ছে? তারা কারা? তারা কি ইউরেনাসের উপগ্রহ না অন্য কিছু?

প্রথম কথা, ইউরেনাসের উপগ্রহগুলির পক্ষে নিয়ম মেনে আলোর আগমন বন্ধ করা সম্ভব নয়। তারা ইউরেনাসের দুপাশে সমান সমান দূরত্বে অবস্থান করে না, ততটা শৃঙ্খলা নেই। তাহলে আর কি হতে পারে?

বিজ্ঞানীরা বললেন, ইউরেনাসের চারপাশে বলয় আছে। কম করে পাঁচ পাঁচটি বলয় ইউরেনাসের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। ইউরেনাসের মূল 'গ্রহণের' আগেই নক্ষত্রের আলোকে বলয়ের পাতলা বাধার সামনে পড়তে হয়েছিল। এক একটি বলয়ের মুখে আলো পড়েছে, আর

পৃথিবীর মানমন্দিরে আলো কমে গেছে। তারপর নক্ষত্রটি সরে যাওয়ায় তার চলার পথে বাধা সরে গেছে, আবার আলোর পরিমাণ বেড়েছে। এরপর দ্বিতীয় বলয়ের মুখে পড়ে আবার আলো কমেছে, তারপর বেড়েছে। এভাবে পাঁচটি বলয় পর পর পাঁচবার আলো কমিয়েছে। শেষে শুরু হয়েছে নক্ষত্রের আসল 'গ্রহণ'। পঁচিশ মিনিটের 'গ্রহণ' শেষ হবার পর ফের ওপাশের বলয়ের মুখে নক্ষত্রের আলো পড়েছে। আবার সেই আগের মতো আলোর বাড়া-কমা।

ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা চারদিকে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এতদিন জানা ছিল যে শনি গ্রহেই বলয় আছে। কিন্তু না, শনিরও ভাগীদার আছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে 'রথের সূত্র' ইউরেনাসও মেনেছে। ইউরেনাসের বলয়গুলো রথের সীমানা, তথা 'শনির দশার' মধ্যে অবস্থিত।

ইউরেনাসের অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে তার বলয়গুলি বিশেষত্ব দাবী করতে পারে। শনির বলয়ের তল, তার বিষুবরেখার তলে অবস্থিত। আবার ইউরেনাসের বলয় ঐ গ্রহর বিষুবরেখার তলের উপর প্রায় শুয়ে আছে। যেহেতু ইউরেনাসের বিষুবরেখার তলটি তার সূর্য-প্রদক্ষিণ তলের উপর প্রায় লম্বমান, তাই তার পাঁচটি বলয় সূর্য-প্রদক্ষিণ-তলে লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে দাঁড়িয়ে আছে বলেই তাদের পক্ষে নক্ষত্রের আলোকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শনির বলয়ের মত হলে ইউরেনাসের বলয় হয়তো এতদিনে আমরা আবিষ্কার করতে পারতাম না।

শনির বলয় মূলত পাথর-বরফে মাখামাখি চাঁই দিয়ে গঠিত, কিন্তু ইউরেনাসের বলয়ে বরফের তেমন চিহ্ন নেই, আছে শুধু পাথরের টুকরো। এই বলয়ের আলো-প্রতিফলনের ক্ষমতা কম, তাই চট্ করে দেখাও যায় না।

আর একটা মজার কথা। ইউরেনাসের উপগ্রহগুলি ঐ বলয়ের তলেই ভাসছে। তার অর্থ, ইউরেনাসের উপগ্রহগুলির জন্ম ও বলয়ের জন্মরহস্য একই জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেই রহস্যকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

ছোট সূর্য, বড় সূর্য

রাতের আকাশে কত তারা। ঘন কালো আকাশের পটে নক্ষত্র দেখতে দেখতে মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু দিনের আকাশে যে রাজত্ব করছে, সে-ই যে সূর্য, তার দিকে তাকাতেই ইচ্ছা করে না। চোখ ধাঁধানো আলোয় সে যে কতটা বড় তা ঠাহর করা যায় না। কিন্তু তাই বলে কি আকাশের নীলিমায় সূর্যের পরিভ্রমণ দেখার মত নয়? নিশ্চয় না, সূর্যেরও অনেক মজা আছে।

এমন একটা মজার কথা বলি। আমাদের ধারণা যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য আকারে বড় দেখায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিভ্রম। অস্তগামী সূর্য ও মধ্যগগনের সূর্যের ফটোগ্রাফ তুলে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে মোটেই কোন ফারাক নেই। দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ এই যে অস্তগামী সূর্য দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে বলে দিগন্তের গাছপালা ইত্যাদির সঙ্গে সূর্যের একটা তুলনা এসে পড়ে। তুলনামূলক বিচারে গাছপালার পাশে সূর্যকে বড় মনে হয়।

কিন্তু তাই বলে কি সূর্য কখনও বাড়ে না, বা কমে না? না, সূর্য নিজে থেকে বাড়ে বা কমে না। তবে সারাবছর ধরে সূর্যকে ভালো করে লক্ষ্য করলে তার মাপের হেরফের দেখা যায়। সূর্যের ব্যাসের মাপ কখনও বাড়ে, কখনও কমে। ইংরাজী বছরের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে সূর্যকে সবচেয়ে বড় দেখায়। বছরের মাঝা-মাঝি জুলাই মাসে সূর্যকে সবচেয়ে ছোট দেখায়। তবে এই পার্থক্য খুব বেশি নয়। পৃথিবী থেকে যে সূর্য আমরা দেখি, তার ব্যাসের শতকরা তিন ভাগ মাত্র বাড়ে বা কমে।

একবার একটি পনেরো বছরের বালক সূর্যের প্রতিচ্ছবি মেপে এই পার্থক্যের হদিশ দিয়েছিল। সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার ব্যাস

মাপা যায় না। একটি ছোট কার্ডবোর্ডের ফুটোর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো এসে, কিছুটা তফাতে রাখা একটি স্ক্রিনে পড়লে সূর্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তারপর সহজেই প্রতিচ্ছবির মাপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রতিবছর সূর্য নিজে থেকে একবার ফুলবে, একবার সঙ্কুচিত হবে—তা তো হয় না। তাহলে সূর্যের মাপের পরিবর্তনের কারণ কি? কারণ, দোসরা জানুয়ারীতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সব থেকে কম থাকে, আর চৌঠা জুলাই-এ হয় সবচেয়ে বেশি। দূরের জিনিসকে ছোট দেখায়, কাছের জিনিস বড় দেখায়—এই কারণ।

পৃথিবী একটি উপবৃত্তের পথে সূর্যকে পরিক্রমা করে। সূর্য ঐ উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus) অবস্থান করে। উপবৃত্তটি দেখতে কেমন? ঐ পনেরো বছরের কিশোর তা-ও এঁকেছিল। একটি বছরের বিভিন্ন দিনে সূর্যের প্রতিচ্ছবির ব্যাস মেপে, ঐ মাপ থেকে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের একটা হদিশ পাওয়া গেল। তারপর গ্রাফ কাগজে বছরের বিভিন্ন দিনের ঐ সূর্যের দূরত্বগুলি বসালে যে আবদ্ধ রেখা পাওয়া যায়, তাই পৃথিবীর 'পরিক্রমা পথ'। পৃথিবীর পরিক্রমা পথটি একটি উপবৃত্ত। তবে চট্ করে দেখলে বোঝা যায় না, প্রায় বৃত্ত বলেই মনে হয়।

দোসরা জানুয়ারীতে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সব থেকে কম, ঐ বিন্দুটি উপবৃত্তের অনুসূর বিন্দু (perihelion)। আবার চৌঠা জুলাই-এর সূর্যের দূরত্ব সব থেকে বেশি, পৃথিবী তখন উপবৃত্তের অপসূর বিন্দুতে (aphelion)। ডিম্বাকার উপবৃত্তের যে বিন্দু নাভির কাছে তার নাম অনুসূর বিন্দু, বিপরীত দিকে যে বিন্দু নাভি থেকে সবচেয়ে দূরে তার নাম অপসূর বিন্দু।

সব গ্রহই সূর্যকে উপবৃত্তের পথে আবর্তন করে। কাজে কাজেই একদিন সূর্যকে বড় দেখাবে, একদিন ছোট---তা স্বাভাবিক। তবে মজার কথা যে, দোসরা জানুয়ারীতে উত্তর গোলার্ধের দিন সবচেয়ে ছোট হয়ে যায় না, সবচেয়ে ছোট দিন হয় ২২শে ডিসেম্বর। তেমনি

চৌঠা জুলাই-এ উত্তর গোলার্ধে সব থেকে বড় দিন হয় না, সে দিন ২২শে জুন।

২১শে মার্চ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন রাত্রি সমান। ২১শে মার্চ সূর্য ভরদুপুরে বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে সূর্যালোক ফেলবে। এরপর যতদিন যাবে তত সূর্য উত্তর গোলার্ধের অক্ষাংশের উপর ভরদুপুরে আলো ফেলবে এবং ২২শে জুন কর্কটক্রান্তি রেখার (২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) উপর ঠিক দুপুরে সূর্যালোক পড়বে। ২১শে মার্চ থেকে ২২শে জুন—উত্তর গোলার্ধের বসন্তকাল। এরপর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়—সূর্য ক্রমশ দক্ষিণের দিকে নামতে শুরু করে। অবশেষে ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য পুণরায় বিষুব রেখার উপর মধ্যদুপুরে কিরণ দেয়। ২২শে জুন থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর – উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকাল। এরপর সূর্য আরো নেমে যায়, ২২শে ডিসেম্বর মকরক্রান্তি রেখার (২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশ) দুপুর বেলা তাপ ও আলো দেয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর—উত্তর গোলার্ধের শরৎকাল। ২২শে ডিসেম্বরের পর সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়, শেষে ২১শে মার্চ আবার সূর্য উঠে এসে বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে আলো দেয়। এই ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে মার্চ—উত্তর গোলার্ধের শীতকাল।

আবার আগের আলোচনায় ফিরে আসি। ঐ যে পনেরো বছরের কিশোর, যে সূর্যের ব্যাস মেপে, একটি উপবৃত্ত এঁকেছিল তা পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমা পথের মতো হলেও, তা আসলে সূর্যের আপাত পৃথিবী-পরিক্রমা পথ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে, আর আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যের আপাত পরিক্রমা দেখি।

সূর্যের আপাত পরিক্রমা পথও একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্তের নাভিতে পৃথিবী আছে। ঐ উপবৃত্তের উপর চারটি বিন্দু আছে, যে চার বিন্দুতে সূর্য ২১শে মার্চ, ২২শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২২শে ডিসেম্বর অবস্থান করছে। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখা লম্বভাবে ২২শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বরের সংযোগকারী রেখাকে ছেদ করে যাবে।

সূর্যের আপাত পরিক্রমা পথের নাভিতে পৃথিবী অবস্থান করছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের সর্বাপেক্ষা বেশি দূরত্ব হবে চৌঠা জুলাই তারিখে। চৌঠা জুলাই সূর্য থাকবে উপবৃত্তের এক প্রান্তে, যা পৃথিবী থেকে দূরতম দূরত্বে অবস্থিত। এই বিন্দুর নাম 'অপভূ' (apogee)। দোসরা জানুয়ারীতে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব ন্যূনতম, ঐ দিন সূর্য যেখানে অবস্থান করছে তার নাম 'অনুভূ' (perigee) বিন্দু।

মোট কথা, -২শে জুন সূর্য অপভূ বিন্দুতে এবং ২২শে ডিসেম্বর সূর্য অনুভূ বিন্দুতে অবস্থান করেনা। সূর্যের আপাত পৃথিবী-পরিক্রমা নিয়ে এর পরে আলোচনা করা যাবে।

২১শে মার্চ ও ২৩শে ডিসেম্বরের সংযোগকারী রেখা এবং ২২শে জুন ও ২২শে ডিসেম্বরের সংযোগকারী রেখা সূর্যের পরিক্রমা-উপবৃত্তকে চারভাগে ভাগ করে। এই চারভাগ কিন্তু সমান নয়। এক একভাগে যা ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তা ঐ সময়কার ঋতুকালের সমানুপাতী। উত্তর গোলার্ধের বসন্তকাল ৯২ দিন ২০ ঘন্টা, গ্রীষ্মকাল ৯৩ দিন ১৫ ঘণ্টা, শরৎকাল ৮৯ দিন ২০ ঘন্টা এবং শীতকাল ৮৯ দিন ১ ঘন্টা ব্যাপী পাওয়া যায়।

২১শে মার্চ থেকে ২২শে জুনের মধ্যে সূর্য উপবৃত্তের পৃথিবী-কেন্দ্রে যতটা ক্ষেত্রফল সূর্য উৎপন্ন করবে, তা উত্তর গোলার্ধের বসন্তকালের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতী। এভাবে অন্য ঋতুকালও নির্ণয় করা যায়।

মজার কথা যে—উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ছোট, গ্রীষ্ম বড়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে শীত বড়, গ্রীষ্ম ছোট। দু-গোলার্ধের দুরকম ভাগ্য। দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল বড় হওয়ার দরুণ আন্টার্কটিকায় বরফ জমে প্রচুর, তুলনায় উত্তর মেরুতে বরফ কম। এক বছর বেশি বরফ জমলে সেই সাদা বরফ আরো বেশি করে সূর্যের তাপ ও আলো প্রতিফলিত করবে। তাতে ঠাণ্ডা বাড়বে, আরো বরফ পড়বে। এভাবে পৌনঃপুনিক পদ্ধতিতে বরফ বেড়ে যাবে, তুষার যুগের শুরু হবে। সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর তুষার যুগের এরকম একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

নেমেসিসের উৎপাত

মহাকাশের অধিকাংশ নক্ষত্রই জোড়া বেঁধে আছে। দুটি নক্ষত্র—তাদের ভরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবসাব—এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। ঐ যে মাথার উপরের নক্ষত্র লুব্ধক, যা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সে-ও একলা নয়, তারও একটি সঙ্গী আছে। লুব্ধকের সঙ্গীর ভর খুবই বেশি, কিন্তু তার আয়তন কম। তাই লুব্ধকের মত জ্বল জ্বলে নক্ষত্রর সাথী হয়েও তাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। তবে যন্ত্রের কাছে সে ধরা পড়েছে।

যুগ্ম নক্ষত্রের একটি অন্যটিকে সর্বদা প্রভাবিত করে। একজনের চলার পথকে অন্যজন ঘুরিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়। তাই যুগ্ম নক্ষত্রর একটির চলমান পথের নিশানা দেখেই আমরা বলে দিতে পারি—কে কখন কোথায় তাকে আকর্ষণ করছে।

কোটি কোটি নক্ষত্র মিলে যে জগৎ তার নাম 'তারাজগত'। এরকম হাজারে হাজারে তারাজগত মহাকাশে ছড়িয়ে আছে। এক একটা তারাজগতের মধ্যের নক্ষত্রগুলি মোটেই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যুগ্ম নক্ষত্রগুলিও তাদের একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। যুগ্ম নক্ষত্রকে সংযোগ করেছে যে রেখা, তার উপর ঐ ভর-কেন্দ্র অবস্থিত। যদি নক্ষত্রদ্বয়ের ভর সমান হয়, তবে ভরকেন্দ্রটি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে; অন্যথায়, যে নক্ষত্রর ভর বেশি তার দিকে এগিয়ে থাকবে।

যাই হোক, এমন ভরকেন্দ্রকে একটি উপবৃত্তের নাভি করে নিয়ে নক্ষত্র ঐ উপবৃত্তের পথে ঘুরে বেড়ায়। যুগ্ম নক্ষত্রর দুটিই তাদের

পরিক্রমা পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসবে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র তো আর ভুল নয়, তাই সে সময়, অর্থাৎ যখন তারা কাছাকাছি থাকে, তখন একে অন্যকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি।

অনেককাল থেকে আমাদের সূর্যকে একক নক্ষত্র বলে মনে করা হত। বিজ্ঞানীরা বলতেন—সূর্য বড়ই নিঃসঙ্গ, একা একা সে মহাকাশে বিচরণ করছে। অবশ্য তার সঙ্গে গ্রহ উপগ্রহরা আছে, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে অন্য কোন নক্ষত্র নেই।

আজকাল বিজ্ঞানীরা মত বদলাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন – না, সূর্যেরও সঙ্গী আছে। বেশ কয়েক আলোক বৎসর দূরে তার সাথী অবস্থান করছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'নেমেসিস'। লম্বা মাপের উপবৃত্তের পথে নেমেসিস ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যও অন্য একটি উপবৃত্ত ধরে মহাকাশে ভ্রাম্যমান। লম্বা উপবৃত্তের পথ পাড়ি দিতে নেমোসসের এক আধ বছর সময়ে কুলোয় না, লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। মহাকাশ পাড়ি দিতে দিতে নেমেসিস এক সময় সূর্যের কাছাকাছি আসে, আর সে সময় দারুণ অঘটন ঘটতে থাকে। কি অঘটন?

এ কথা কে না জানে যে ধূমকেতুগুলি এই সৌরজগতের অঙ্গ। সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তে ধূমকেতুগুলির জন্মস্থান। সেই সুতিকাগারে রয়েছে মহাজাগতিক মেঘ, ধুলো, গ্রহভাঙ্গা টুকরো—আরো কত কি। ধূমকেতুগুলি সেখান থেকে সূর্যের টানে আসে। ধূমকেতু যখনই সূর্যের কাছাকাছি আসে তখনই পৃথিবীতে উল্কাপাত হয়।

নেমেসিস নক্ষত্রর চারপাশে ধূমকেতুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেমেসিসের আওতার মধ্যে যে সব ধূমকেতু আছে তারা আকারে বেশ বড়, নেমেসিসের সঙ্গে তারাও তারাজগতের মধ্যে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের অভিমত, নেমেসিস যখন সূর্যের কাছে আসে, তখন নেমেসিসের ধূমকেতুগুলি থেকে অসংখ্য উল্কা সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহর উপর ঝরে পড়ে। তখন পৃথিবীর আকাশে উল্কাপাতের ঘনঘটা অসম্ভব

রকমের বাড়ে। সে যে কি উল্কাপাত তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। আকাশ উল্কার ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, উল্কার আঘাতে মাটি থেকে ধুলো ওঠে, বাতাস উল্কার ধুলোয় ভারী হয়ে যায়। একদিন দুদিন নয়, বছরের পর বছর এমন অবস্থা চলে। নেমেসিস যেমন দু-এক বছরে সূর্যের কাছে আসে না, তেমনি দু-একদিনে সে চলেও যায় না। দিনের পর দিন এসব চললে পৃথিবাতে যে ভীষণ গোলমাল দেখা দেবে. তা তো ঠিক। আকাশ ধূলিময় হলে সূর্যের তাপ কম করে পৃথিবীতে আসবে, পৃথিবীতে নতুন করে এক হিমযুগ নেমে আসবে। আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে, অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু সত্যি সত্যি যে এমন ভয়াবহ উল্কাপাত কোন দিন হয়েছিল তার প্রমাণ কি? উল্কা কোন সাধারণ পাথর নয়, গ্রহ উপগ্রহ ভেঙ্গে উল্কা হয়েছে। তাই উল্কাতে এমন কিছু ধাতু এমন পরিমাণে পাওয়া যায় যে পৃথিবার পাথরে তা সম্ভব নয়। এ রকম একটি ধাতুর নাম ইরিডিয়াম। ভূ-বিজ্ঞানীরা আমাদের জানাচ্ছেন যে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ইরিডিয়াম-সমৃদ্ধ উল্কা পৃথিবাতে পড়েছিল। ইতালির একটি উপত্যকাতে, যেখানে ধারে কাছে কোন ইরিডিয়াম নেই, সেখানে কোন একটি বিশেষ স্থানে প্রচুর উল্কা পাওয়া গেছে, আর আছে ইরিডিয়াম। তাছাড়া, সমুদ্রের নিচে, আন্টার্কটিকার বরফের মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি বছরের পুরানো পাথরে অনেক অনেক ইরিডিয়াম ধাতুর খোঁজ পাওয়া গেছে। এসব দেখে একটাই সিদ্ধান্ত করা যায়—সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ভীষণ রকমের উল্কাপাত হয়েছিল। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ঐ সাড়ে ছয় কোটি বছর আগেই ডাই-নোসর প্রজাতিরা পৃথিবী থেকে হঠাৎ লুপ্ত হয়েছিল। তাহলে কি উল্কা-পাতের ফলে আবহাওয়ার এমন অদল বদল হয়েছিল যে কোন কোন প্রাণী-উদ্ভিদ আর বাঁচতে পারল না? ডাইনোসরের অবলুপ্তির পিছনে এমন ধরনের ঘটনা থাকতেও পারে।

পৃথিবীকে অনেকবার বিধ্বংসী উল্কাদের মুখে পড়তে হয়েছে। আর প্রতিবারই অঘটন ঘটেছে। আগামী দিনে নেমেসিসের উল্কারা আবার পৃথিবীতে আসবে। সে দিনের এখন দেরি আছে। ইতিমধ্যে মানুষ নিশ্চয় আরো উন্নতমানের সভ্যতা গড়ে তুলতে পারবে। সেই উন্নত প্রযুক্তিই তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে—এই আশা করি।

মধ্যরাতের সূর্য

'সূর্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়'—এমন সত্য আর কি আছে? তাই কথায় বলি—'অসম্ভব ঘটনা ঘটা যা, পশ্চিমে সূর্যোদয়ও তাই।' ঘটনার অবাস্তবতার সঙ্গে পশ্চিমে সূর্যোদয়কে অবলীলায় জড়িয়ে দিই। কিন্তু সত্যিই কি উদয় অস্তের ব্যাপারটা এতই সত্য? এতটা কি নিশ্চিন্ত হতে পারি?

ভৌগলিক বিষয়গুলি আলোচনার সময় আমরা মনে মনে ধরে নিই, আমরা সবাই উত্তর গোলার্ধবাসী। তা না হলে—'গরমকালে ইউরোপে দিন বড়, রাত ছোট'—বলি কেন? কেনই বা ডিসেম্বর জানুয়ারী বলতে শীতের কথা মনে আসে? আসলে স্থলভাগের বেশির ভাগটাই উত্তর গোলার্ধে, তারপর উত্তর গোলার্ধের মানুষরাই দীর্ঘকাল মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতি। তাই আমাদের মনেই থাকে না যে ডিসেম্বর জানুয়ারীতে আর্জেন্টিনায় গরম, মনে থাকে না—যখন দক্ষিণ গোলার্ধের শীতকাল তখন ইউরোপের দিন বড়। তাই সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বিষয়ে একটি স্থায়ী ধারণা মানুষের মনে দানা বেঁধেছে, কারণ মানুষ বাস করে প্রধানত পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে। গোলার্ধ-ভেদে, মেরু অঞ্চল ভেদে, অক্ষাংশ ভেদে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের অবস্থান কিরকম বদলে যায় তা কি কখনও খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছি? ভেবে দেখি, দেখা যাক কত মজা এতে লুকিয়ে আছে।

লেনিনগ্রাডের মানুষেরা বছরের কয়েকদিন একদম রাত দেখতে পায় না, দিনভর শুধুই দিন—আকাশের সূর্যের অস্ত যাবার নাম নেই। 'রাত' বারোটা—একটাতেও সূর্যের আলো। ঘুমোবার উপায় কি? চোখে যে সূর্যের আলো পড়ে! মশারী টাঙিয়ে পরিবেশটা কিছুটা

নৈশকালীন করে লেনিনগ্রাডবাসীরা নিদ্রার আশ্রয়ে যায়। এরই নাম 'হোয়াইট নাইট'। তেমনি আবার বছরের কয়েকদিন তারা মোটেই সূর্যের আলো দেখে না, দিনরাত শুধুই রাত।

এ তো গেল লেনিনগ্রাডের কথা। ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের উপর বা ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশের নিচে যে কোন স্থানে লেনিনগ্রাডের দশা হবে। যতই এই অক্ষাংশ বাড়বে ততই শুধুই দিন বা শুধুই রাতের ব্যাপারটা চলবে বেশি দিন ধরে।

সূর্যের চারদিকে যে তলে পৃথিবী ঘুরছে তার লম্বর সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা ২৩½° হেলে আছে। বছরের কোন সময় সূর্য লম্বভাবে বিষুবরেখায় আলো ফেলে, কখনও কর্কটক্রান্তিতে (২৩½° উ), কখনও মকরক্রান্তিতে (২৩½° দ) লম্বভাবে কিরণ দেয়। পৃথিবীর এই ২৩½° হেলে থাকাই সব কিছুর মূলে। পৃথিবীর আবহাওয়া ও তার বৈচিত্র্য, জনজীবনের পার্থক্য, লেনিনগ্রাডের দিনভর দিন বা রাত—সব কিছুর জন্য দায়ী এই হেলানো পৃথিবী। পৃথিবী না হেলে থেকে যদি সটান লম্বভাবে তার ঘূর্ণায়মান তলে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে দিনরাতের ফারাক পেতাম না, ঋতুবৈচিত্র্য দেখতাম না।

আমরা যারা গরম দেশ ভারতে বাস করি—তারা সারা বছরে সূর্যের অবস্থানের তারতম্য তেমন বুঝি না। কেবল শীতকালে সূর্য দক্ষিণে হেলে থাকে, শীতের ছায়া দীর্ঘ, গরমকালে সূর্য মাথার উপরে থাকে—এই বুঝি। এতটুকু তফাৎও দক্ষিণ ভারতে গেলে বোঝা যায় না। বিষুবরেখা থেকে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যাবে ততই সূর্যের অবস্থানের তারতম্য নজরে পড়বে। লেনিনগ্রাডের অবস্থা কি আমরা ভারতে ভাবতে পারি? আবার লেনিনগ্রাড ছাড়িয়ে আরো উত্তরে গেলে আরো অকল্পনীয় সূর্যোদয়—সূর্যাস্ত দেখব। অবশ্য দেখা কি আর যাবে? কুয়াসা মেঘ ঝড়ে সূর্যকে চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব। তবু সূর্যের অবস্থান ধরে চিন্তাটা করা যায়।

উত্তর মেরুর কথায় আসা যাক। ঠিক উত্তর মেরুতে দাঁড়ানো কোন দর্শক ২১শে মার্চে দিগন্তরেখা বরাবর সূর্যকে দেখবে। ২১শে

মার্চের সকালে উত্তর দিকে সূর্য উঁকি দেবে, তারপর দিগন্তরেখার উপর দিয়ে সাবধানে চলতে থাকবে, চলতে চলতে সারাদিনে দর্শককে পরিক্রমা করবে, অর্থাৎ উত্তর থেকে পূবে, তারপর দক্ষিণে, তারপর পশ্চিমে, তারপর আবার উত্তরে। একদিন পর (সারাদিনই দিন) যখন সূর্য উত্তরে আসবে ততক্ষণে সে ভূমি থেকে আরো কিছুটা উপরে উঠে এসেছে। কতটা উপরে ? প্রায় ২৩° ৩০′ ÷ ৯০ (২১শে মার্চ সকাল থেকে ২২শে জুন = ৯০ দিন) = ১৫′ ৪০″।

পরের দিন ভূমি থেকে আরো কিছুটা উপরে উঠে সূর্য দর্শককে পরিক্রমা করবে, ঐ একভাবে। উত্তর মেরুতে সূর্য ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে দর্শকের চারপাশে ঘুরবে। তারপরের দিন সূর্য আরো কিছুটা উপরে উঠে সারাদিন ধরে দর্শককে পরিক্রমা করবে। অর্থাৎ, ২১শে মার্চ সেই যে সূর্য দিগন্তরেখার উপরে এল, তারপর আর অস্ত গেল না, দর্শককে মাঝে রেখে সে চারদিকে পাক দিতে লাগল আর ক্রমাগত মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল। উত্তর মেরুর ছয় মাসের দিন এইভাবে শুরু হয়।

এভাবে চলতে চলতে যখন ২২শে জুন আসবে তখন সূর্য মাটি থেকে সবচেয়ে উপরে উঠে আসবে। কতটা উপরে ? মাটি থেকে ২৩½° উপরে।

২২শে জুনের পর সূর্যের নামার পালা। ঠিক যেভাবে ২১শে মার্চের পর সে উপরে উঠেছিল, সেই একই পথে সে এবার ধীরে ধীরে নিচে নামবে। ঘোরানো সিঁড়ির মতো পথে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় নব্বই দিন পর, অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য আবার দিগন্তরেখার উপর নেমে আসবে, এবং তার পরের দিন সেই যে সূর্য দিগন্তরেখার নিচে অস্ত চলে যাবে, তারপর আর তাকে উত্তর মেরুর দর্শক দেখতে পাবে না। শুরু হবে উত্তর মেরুর রাত। ছ'মাস পরে আবার যেই ২১শে মার্চ আসবে সেদিন আবার সূর্য উত্তর মেরুর দিগন্তে উঁকি দেবে এবং ঠিক আগের বছরের মতো দর্শককে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠবে।

উত্তর মেরুতে সূর্যের কথা জানা গেল। দক্ষিণ মেরুতে কি হবে? উত্তর মেরুতে যা যা হয়েছে দক্ষিণ মেরুতে তাই হবে, শুধু দিন আলাদা। দক্ষিণ মেরুতে সূর্য ২৩শে সেপ্টেম্বর দিগন্ত রেখায় আত্মপ্রকাশ করবে, তারপর দর্শককে ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত উপরে উঠে ২২শে ডিসেম্বর সব থেকে উঁচুতে (২৩½°) উঠে আসবে। তারপর শুরু হবে নামার পালা। ২১শে মার্চ সূর্য দিগন্ত রেখায় নেমে আসবে। যখন উত্তর মেরুতে নিরবিচ্ছিন্ন দিন তখন দক্ষিণ মেরুতে রাত, আবার উত্তরে যখন নিরবিচ্ছিন্ন রাত তখন দক্ষিণে দিন।

মেরু দু'টিতে সূর্যের প্রবেশ প্রস্থান নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপর দেখা যাক অন্যত্র কি হয়। যে ২২শে জুন তারিখে উত্তর মেরুর আকাশে সূর্য ২৩½° উপরে অবস্থান করে, সেদিন ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশে সূর্যকে কেমন দেখাবে? ঐ দিন ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের কোন স্থান থেকে সূর্যকে একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে দেখা যাবে এবং সূর্য ঠিক অস্ত না গিয়ে দিগন্তরেখাকে ছুঁয়ে উঠে আসবে। ২২শে জুন সূর্য উত্তর দিগন্ত থেকে উদিত হবে এবং ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরে উঠতে উঠতে পূর্ব দিক ঘুরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে তারপর পশ্চিম হয়ে আবার উত্তরে অস্ত যাবার জন্য নেমে আসবে। সারাদিন এই বৃত্তাকার পথটি অতিক্রম করে সূর্য কিন্তু উত্তরে এসে পুরোপুরি অস্ত যাবে না, বরং উত্তর-দিগন্তের রেখা ছুঁয়ে আবার পরের দিন উদিত হবে। বলা বাহুল্য, বৃত্তাকার পথটি অতিক্রম করতে সূর্যের প্রায় চব্বিশ ঘন্টা সময় লেগে যায়।

সেদিনের সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান হবে ভূমি থেকে ৪৭° উপরে। সূর্যের বৃত্তাকার পথের একপ্রান্ত উত্তর দিগন্ত ছুঁয়ে থাকবে, অন্যপ্রান্ত থাকবে দক্ষিণের আকাশে ৪৭° উপরে। ২২শে জুন ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের কোন স্থানে সূর্যাস্ত হবে না, ঐদিন চব্বিশ ঘণ্টাই দিন।

৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে বা দক্ষিণে সূর্যকে কেমন দেখাবে? ২২শে জুন ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরের যে কোন স্থানে সূর্যকে

সারাদিনে অস্ত যেতে দেখা যাবে না। তবে সূর্য ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে আবর্তিত হবে না, বৃত্তাকার পথে আকাশে ঘুরবে। বৃত্তের উত্তর দিকের অংশ মাটি থেকে যত উঁচুতে থাকবে, দক্ষিণের অংশ তার থেকেও উঁচুতে থাকবে। যত ৬৬½° উত্তর থেকে উত্তরে যাওয়া যাবে, তত সূর্য-পথের বৃত্তের উত্তর দিকের অংশ মাটি ছেড়ে উপরে উঠবে এবং দক্ষিণ দিকের অংশ মাটিতে নেমে আসবে। একেবারে উত্তর মেরুতে দুই প্রান্তের উচ্চতা হবে ২৩½°।

২২শে জুন তারিখে দক্ষিণ মেরুতে সূর্য একেবারেই দেখা যাবে না। শুধু তাই নয়, ৬৬½° দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে কুমেরুবৃত্ত তার কোথাও ২২শে জুন সারাদিনমানে একবারের জন্যও সূর্যোদয় হবে না। কিন্তু ২২শে জুন ঠিক ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশে দাঁড়ানো কোন দর্শক কি একেবারেই সূর্যের মুখ দেখবে না? তা নয়। মাত্র কিছু সময়ের জন্য ঐদিন উত্তর দিগন্তে সূর্য একবার মুখ তুলে পরক্ষণেই ডুব দেবে। যেন একই সঙ্গে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত!

৬৬½° উত্তর ও ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশের মাঝের জায়গাগুলিতে ২২শে জুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই দেখা যাবে। ঐ দিন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর দুপুরবেলা সূর্য মাথার উপর থাকবে। এর উত্তরের স্থানগুলিতে সূর্য উত্তর-পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে, সারাদিনে দক্ষিণ আকাশ ঘুরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অস্ত যাবে। এতবড় পথ পরিক্রমা করতে সূর্যের অনেক সময় লাগবে। তাই ঐ দিন উত্তর গোলার্ধের সব স্থানে দিন বড়, রাত ছোট। ইউরোপের নানা স্থানে রাত দশটায় দেখা যায় আকাশে সূর্য আছে। খেয়েদেয়ে ঘুমোতে না ঘুমোতে আবার পরের দিনের সূর্য আকাশে উঠে পড়েছে।

আমাদের জীবনে সূর্যের মূল্য অপরিসীম। আকাশে সূর্যের অবস্থানের উপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেকটাই নির্ভর করে। সূর্য-ই পরোক্ষভাবে আমাদের জীবন-বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী। মজার জীবনের অনেকটা এসেছে সূর্যের উদয়-অস্তের মজা থেকে!

অনেকদিন আগে একটা কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়েছিলাম। গল্পে লেখক এমন একটি গ্রহের বর্ণনা করেছেন যার আকাশে একাধিক 'সূর্য' ঘুরে বেড়ায়। সূর্যদের আলোয় সেখানে রাত বলে কিছু নেই—সব সময় দিন। একটা সূর্য অস্ত গেল তো অন্যরা আছে। গ্রহবাসীরা অন্ধকারময় রাতের কথা কল্পনাই করতে পারে না!

এবার যদি বলি, আমাদের পৃথিবীও এমন একটা নিরবিচ্ছিন্ন দিনের সৌভাগ্য থেকে অল্পের জন্য বঞ্চিত হয়েছে তাহলে অবাক হতে হবে তো? আমাদের আকাশে একটি সূর্যের বদলে দুটি সূর্য আসবে কোথা থেকে? হ্যাঁ আসতো—যদি,যদি বৃহস্পতি গ্রহ ওজনে আরো কিছুটা ভারী হতো। তাহলে বৃহস্পতি আর গ্রহ থাকত না—হতো আর এক জ্বলন্ত সূর্য! বড় সূর্য অস্ত গেলে আকাশ আলো করে থাকত এই বৃহস্পতি-সূর্য!

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। সূর্য বা বৃহস্পতি—দুই-ই তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে। হাইড্রোজেনটাই আসল, এর সঙ্গে সামান্য অন্য গ্যাসও আছে। এতো যে গ্যাস—তার তো একটা ভর আছে এবং সে ভর যে-সে ভর নয়, বিরাট তার মাপ। বৃহস্পতির আকার এতো বড় যে সে শ'খানেক পৃথিবীকে সোজা গিলে নিতে পারে। সূর্য বা বৃহস্পতির কেন্দ্রে খুব চাপ পড়ে—মাথার উপর অতোটা গ্যাস, তার দরুন এদের কেন্দ্রে বস্তু-চাপও বেশি। চাপের জন্য কেন্দ্রভাগ ভীষণ রকম গরম। সব গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহের পেটের ভেতরটা গরম। আমাদের জানা আছে যে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্র গরম, এতো গরম যে সেখানের পাথর গলে তরল হয়ে আছে।

এখন কথা হচ্ছে, সূর্য তো বৃহস্পতির থেকে বড়। তাই সূর্যের পেট যত গরম, বৃহস্পতির পেট নিশ্চয়ই তত নয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন যে সূর্যদেব পেটে প্রায় এক কোটী ডিগ্রী উষ্ণতা এবং

বৃহস্পতি তার পেটে পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রী উষ্ণতা নিয়ে বসে আছেন। এক কোটী ডিগ্রী উষ্ণতায় চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হয়, আর তার সাথে আসে উত্তাপ ও আলো। এর নাম থার্মোনিউক্লিয় বিক্রিয়া। থার্মোনিউক্লিয় বিক্রিয়ায় সূর্য থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই। কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রীতে এই বিক্রিয়া সম্ভব নয়—হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় না, না পাওয়া যায় উত্তাপ, না পাওয়া যায় আলো। তাই বৃহস্পতি গ্রহরাজ হয়েও সূর্যের মতো জ্বলতে অক্ষম, সূর্যের আলোয় তাকে আলোকিত হতে হয়।

বৃহস্পতি আর কতটা ভারী হলে সূর্যের মতো জ্বলতে পারত? বিজ্ঞানীদের হিসাব—সে ওজনটা বেশি নয়। মহাকাশে ছড়ানো হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘ এক জায়গায় জড়ো হতে হতে গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম হয়। যদি আর কিছুটা হাইড্রোজেন বৃহস্পতির গায়ে জড়ো হত তাহলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু বেচারা বৃহস্পতি! হাইড্রোজেন অকুলানে তার আর নক্ষত্র হওয়া হল না! হলে আমাদের সৌরজগতে থাকত দুটি নক্ষত্র, যাদের 'জোড়া নক্ষত্র' বলা যেত।

প্রসঙ্গত বলি, মহাকাশে এরকম জোড়া নক্ষত্র অনেক দেখা যায়; বরং সূর্যের মতো একক নক্ষত্র কম। আকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধকও তার একটি সঙ্গীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বৃহস্পতি যদি কপাল জোরে নক্ষত্রই হত তাহলে পৃথিবী থেকে আমরা তাকে কেমন দেখতাম? পূর্ণিমার রাতে যেমন আকাশে ভাসে উজ্জ্বল চাঁদ ঠিক তেমনিভাবে বৃহস্পতিকে রাতে জ্বলজ্বল করতে দেখতাম। তার উজ্জ্বল আলোয় রাতের অন্ধকার যেত মিলিয়ে, দিনের ভাগটা বারো ঘণ্টার জায়গায় হয়তো বেড়ে দাঁড়াতো চব্বিশ ঘণ্টা। দিবারাত্র দুটি নক্ষত্রের আলো তাপে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তন হত, সূর্যের চারদিকে যে পৃথিবীর কক্ষপথ তাতেও কিছুটা বক্রতা আসতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার ভেদাভেদ বদলে যেত, হয়তো পেতাম এক কল্প-লোকের পৃথিবী!

হাত বাড়ালেই গ্রহ

আমাদের সৌরজগতে ক'টি গ্রহ আছে ? ন'টি। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। যারা আর একটু খবর রাখে তারা বলবে—মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অসংখ্য ক্ষুদে পাথরের চাঁই রয়েছে, যার নাম 'গ্রহাণুপুঞ্জ'। এই গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে মানুষের অনেক দিনের কৌতূহল। এরা কারা ? কোথা থেকে এলো ? টুকরো কেন ? ইত্যাদি।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বডে বড় বড় অঙ্ক কষে একটা হিসাব দিলেন। হিসাবটা এই—সূর্য থেকে কতগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে গ্রহগুলি ঘুরবে। সূর্য থেকে কত দূরে দূরে গ্রহগুলি ঘুরবে তা বডে সাহেব অঙ্ক কষে বলে দিলেন। অঙ্ক যে সব দূরত্ব বলছে, বাস্তবে গ্রহগুলি ঠিক সেই দূরত্ব মেনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বডের হিসাব অনুযায়ী মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে একটা গ্রহের থাকার কথা। কিন্তু কই সে গ্রহ ?

বডের অনেকদিন পরে, আরো ভালো দূরবীণ চোখে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে আস্ত একটা গ্রহের বদলে পেলেন টুকরো টুকরো গ্রহ বা গ্রহখণ্ড। তাহলে কি একদিন এখানে একটা গ্রহ ছিল ? এক সময় কোন কারণে সে গ্রহ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে ? কেন ভাঙ্গল ? কে ভাঙ্গল ? এই সব নানা প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু কে জবাব দেবে ?

শেষ রুশ বিজ্ঞানীরা বললেন, কোন অতীতকালে একদিন ঐ গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল। সেখানকার প্রাণীরা উন্নতির শিখরে উঠে এমন হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছে যে তার ধাক্কায় গ্রহটা টুকরো

টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদেরই একটা বড়সর টুকরো ছিট্‌কে সৌরজগতের প্রায় বাইরে চলে এসেছিল। একটুর জন্য সূর্যের বাঁধন ছেঁড়েনি। এটাই প্লুটো। প্লুটো যেখানে আছে, বডের হিসাব অনুযায়ী সেখানে কোন গ্রহ থাকার কথা নয়। তাছাড়া, প্লুটোর পথটাও কেমন যেন বেশি বাঁকানো। এমনভাবে বাঁকানো যে প্লুটো তার বছরের কোন এক সময়ে নেপচুনের কক্ষপথের ভিতরে এসে পড়ে। অর্থাৎ, সে সময় সৌরজগতের শেষতম গ্রহ হয় নেপচুন, প্লুটোন য়। তবে মনে হয় রুশী বিজ্ঞানীদের এটা নেহাতই কল্পনা।

গ্রহাণুপুঞ্জর একটা খণ্ড যেমন বাইরে গেছে তেমনি দু'একটা ছোট-খাটো খণ্ড মঙ্গল পেরিয়ে পৃথিবীর কাছে চলে এসেছে। এরকম একটা টুকরোর নাম 'এরস্'। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডবলু. উইট এরস্‌কে আবিষ্কার করেছিলেন। এরস্ আবিষ্কারের পর আরো কয়েকটি অস্বাভাবিক পথে বিচরণকারী গ্রহর টুকরো পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন পুরুষের নামে। যারা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের স্বাভাবিক পথে চলাচল করে তাদের সবার নাম মেয়েদের নামে।

পৃথিবীর সব থেকে কাছের গ্রহ কে? অবশ্যই শুক্র। শুক্র মাঝে মাঝে পৃথিবীর চার কোটি কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়ে। এরস্ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর দু' কোটি কিলোমিটারের মধ্যে আসে। তার মানে, এরস্-ই তখন পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ, শুক্র নয়। শুক্রগ্রহকে আমরা খালি চোখে পূব আকাশে বা পশ্চিমে দেখতে পাই, কিন্তু ছোট্ট বলে এরস্ চোখ এড়িয়ে যায়। শুধু এরস্ কেন, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আরো দুটি গ্রহখণ্ড মঙ্গলের এপারে পাওয়া গেল। এদের নাম—আমোর এবং আপোলো। আমোর পৃথিবীর এক কোটি মাইলের মধ্যে আসে। আপোলো তো আরো কাছে, পৃথিবী থেকে মাত্র সত্তর লক্ষ মাইল দূরে তার অবস্থান।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ালটেয়ার বডে আর একটা কাছের গ্রহখণ্ড

খুঁজে পান। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্র চল্লিশ লক্ষ মাইল। নাম দেওয়া হল 'আইকেরাস'। কেন এই নাম? গ্রীক পুরাণে আইকেরাস বলে এক দেবতার কথা আছে। তিনি উড়তে উড়তে সূর্যের এত কাছে চলে গিয়েছিলেন যে সূর্যতাপে তাঁর মোম লাগানো ডানা দুটি গলে গিয়ে তিনি মারা যান। গ্রহখণ্ডটির আইকেরাস নামকরণের পিছনে যুক্তি, ঘুরতে ঘুরতে এই গ্রহখণ্ড সূর্যের খুব কাছে চলে আসে। একমাত্র ধূমকেতু ছাড়া আর কেউ সূর্যের এত কাছে আসে না।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি গ্রহখণ্ড পাওয়া গেল। এর নাম 'হারমেস'। হারমেস ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। এমন কি চাঁদের থেকেও কাছে। হিসাব মতো, তখন হারমেসের দূরত্ব থাকে মাত্র দু'লক্ষ মাইল!

পৃথিবীতে বেশ ভালো রকমের উল্কাপাত হয়। উল্কাদের বেশির ভাগটা বাতাসে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়। তা যদি না হত তাহলে আকাশের এই ঢিলগুলোই আমাদের শেষ করে দিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এত যে উল্কা—তাদের অনেকগুলোই ঐ গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে আসে। এদের বেশ কয়েকটা বড় মাপের খণ্ড পৃথিবীর খুব কাছে, প্রায় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

এরস্ লম্বায় পনেরো মাইলের মতো। এতো বড় পাথর যদি পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে? কি হবে? বিজ্ঞানীরা বলেছেন—মাভৈ। নিয়মের বাঁধনে বাঁধা এসব ঢিল ঠিক মতো উড়ে যাবে, পড়বে না। অতএব নিশ্চিন্তে পৃথিবীর বুকে আমরা হেঁটে বেড়াতে পারি।

চাঁদের আকাশে পৃথিবী

পৃথিবী থেকে চাঁদ দেখতে আমরা বড়ই ভালবাসি -- সে চাঁদ পূর্ণিমার গোল চাঁদ বা আধখানা বা কাস্তের মতো একফালি, যাই-ই হোক না কেন। কিন্তু চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে ?

কেমন দেখাবে তা জানতে নীলস্ আর্মস্ট্রং-এর কাছে যেতে হয়, তিনিই তো প্রথম চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছিলেন। তবে আর্মস্ট্রং-ও দীর্ঘকাল চাঁদে ছিলেন না, তাঁর পক্ষে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব নয়।

তাহলে ? চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পৃথিবীর যে সব ছবি তোলা হয়েছিল তা দেখেও আমরা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। হয়তো পারি। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে নিজেরা ভাবলেও জবাব মিলবে। শুধু জবাব নয়, এর মধ্যে একটা মজাও আছে।

আলোচনাটা করার আগে আর একটা প্রশ্ন রাখছি। প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে চাঁদের অনালোকিত অংশে একটা হালকা আলোর আভা ছড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়—আবছা আলো দিয়ে গড়া ঐ অংশ এবং বাকি ফালির মতো আলোকিত অংশ —দুই মিলে যেন পূর্ণচন্দ্র ! হালকা আলোটা কোথা থেকে আসে ? ওকি দৃষ্টিভ্রম না বাস্তব ?

পূর্ণিমার রাতে পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও আর একপাশে চন্দ্র অবস্থান করে। সূর্যের আলো সরাসরি চাঁদে পড়ে। ঐদিন পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোয় আলোকিত পূর্ণ চন্দ্র দৃশ্যমান। কিন্তু সেদিন চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাবে না। কারণ, পৃথিবীর যে দিকে চাঁদ তার বিপরীত দিকে সূর্যের আলো পড়বে। অর্থাৎ, যে দিনে পৃথিবী থেকে পূর্ণচন্দ্র

দেখা যায়, সেদিন চাঁদ থেকে পৃথিবী দৃশ্যমান নয়, বা চাঁদের আকাশে 'পৃথিবীর অমাবস্যা'।

আবার, অমাবস্যায় পৃথিবীর একই দিকে চাঁদ ও সূর্য অবস্থান করে। ঐ রাতে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নয় চাঁদের যে পিঠ, তাতেই সূর্যালোক পড়ে, পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের পিঠে রাতের অন্ধকার। এখন বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সময় চাঁদ থেকে পূর্ণালোকিত পৃথিবীকে দেখা যাবে। রাতের অন্ধকারে চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে দেখব আলোকিত পৃথিবী বা 'পৃথিবীর পূর্ণিমা'। অমাবস্যায় চাঁদের আকাশে পূর্ণ-পৃথিবী!

যেদিন পৃথিবী থেকে আমরা সপ্তমীর আধখানা চাঁদ দেখি সেদিন চাঁদ থেকেও পৃথিবীর মাত্র আধখানাই দেখা যাবে, অর্থাৎ অর্ধালোকিত পৃথিবী। শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে চাঁদের আধখানা দেখা যায়। এদিন চাঁদ ও পৃথিবীর সংযোগকারী রেখা লম্বভাবে পৃথিবী ও সূর্যের সংযোগ-কারী রেখার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই, যে বিশেষ অবস্থানের জন্য (লম্বভাবে) পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের আধখানা দেখি, সেই অবস্থানের কারণেই চাঁদ থেকে পৃথিবীর আধখানা দেখা যাবে।

যেদিন পৃথিবী থেকে দ্বিতীয়ার বাঁকা একফালি চাঁদ দেখা যাবে সেদিন চাঁদ থেকে দেখব 'দ্বাদশীর পৃথিবী'! 'দ্বাদশীর পৃথিবী' কি? পূর্ণালোকিত পৃথিবীর থেকে কিছুটা কম আলোকিত পৃথিবীকে 'দ্বাদশীর পৃথিবী' বলা হয়। এর কারণ কি? চান্দ্র-দ্বিতীয়ার দিনে, পৃথিবী থেকে চাঁদের যতটা আলোকিত অংশ দেখা যায়, চাঁদ থেকে ঠিক ততটাই পৃথিবীর অন্ধকার দেখায়, বাকিটা আলোকিত।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে চাঁদের এক ফালি অংশ আমরা দেখতে পাই। ঐদিন চাঁদ ও পৃথিবীর সংযোগকারী রেখা প্রায় ২৫° কোণ করে পৃথিবী ও সূর্যের সংযোগকারী রেখাকে ছেদ করে। সেদিন, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে তা জানতে হলে, দেখতে হবে—কবে আবার চাঁদ ও পৃথিবীর যোগাযোগকারী রেখা প্রায় ২৫° কোণ করে চাঁদ ও

সূর্যেয় সংযোগকারী রেখার উপর হেলে থাকবে। চাঁদ যে পথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে ঐ পথের যেখানে চাঁদ থাকে, ঠিক তার বিপরীত দিকে (১৮০°) কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে চাঁদ অবস্থান করে। ঐ দুই অবস্থানেই আলোচ্য কোণটি প্রায় ২৫° হয়। সুতরাং শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে পৃথিবী থেকে চাঁদের একফালি দেখি, আর ঐদিন চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখাবে সেই রকম, যেরকম আমরা কৃষ্ণাদ্বাদশীতে চাঁদকে দেখি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ চাঁদ থেকে দেখা যাবে। এরই নাম "দ্বাদশীর পৃথিবী"।

চাঁদ থেকে বিভিন্ন দিনে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে, তার একটা সোজা ফর্মুলা করে দিই :

পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চাঁদের আলোকিত অংশ +
চাঁদ থেকে দৃশ্যমান পৃথিবীর আলোকিত অংশ = ১

দ্বিতীয়ার চাঁদের অনালোকিত অংশে যে হালকা আলো তা আসলে 'পৃথিবীর জ্যোৎস্না'। 'পৃথিবীর জ্যোৎস্না' কথাটাই বেশ মজার! এতদিন জ্যোৎস্না বলতেই আমরা চাঁদের জ্যোৎস্না বুঝতাম। কিন্তু চাঁদ থেকে আকাশে উজ্জল পৃথিবী যে দেখছে, সে-ও তো চাঁদের মাটিতে পৃথিবী থেকে ঠিকরে আসা আলো দেখবে। চাঁদের জ্যোৎস্নার থেকে পৃথিবীর জ্যোৎস্না ঢের বেশি জোরালো। প্রথমত, চাঁদের থেকে পৃথিবী অনেক বড়; তারপর, পৃথিবীর বিশাল জলরাশি সূর্যরশ্মির বিপুল অংশকে প্রতিফলিত করে। দেখা গেছে. চাঁদের শুকনো পাথুরে জমি যতটা সূর্যালোক প্রতিফলিত করে, তার চেয়ে অনেক বেশি আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা রাখে পৃথিবীর জল, মেরুর বরফ।

চান্দ্র-দ্বিতীয়ার দিনে চাঁদের আকাশে ভাসে প্রায় পূর্ণ পৃথিবী (দ্বাদশীর পৃথিবী)। ঐ দ্বাদশীর বিপুল জ্যোৎস্না চাঁদের অন্ধকারের অনেকটাই কাটিয়ে দেয়। চান্দ্র-দ্বিতীয়ার একফালি উজ্জল চাঁদ বাদে বাকি যে অংশ অন্ধকারময় হওয়া উচিত, তা কিন্তু পৃথিবীর জ্যোৎস্নায় অন্ধকার না হয়ে হালকা আলোয় আভাসিত হয়। বলতে গেলে, দ্বিতীয়াতেও আমরা পুরো চাঁদ দেখতে পাই – কিছুটা সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, বাকিটা পৃথিবীর আলোয় আভাসিত।

চাঁদের আলোয় কত কবিতা লেখা হয়েছে, গান গাওয়া হয়েছে, চড়ুইভাতি করতে আমরা বেড়িয়ে পড়েছি। এখন চাঁদে গিয়ে পৃথিবীর জ্যোৎস্নায় আমোদ আহ্লাদ করাটাই বাকি। ব্যাপারটা কেমন হবে? আদৌ কি কোনদিন তা হবে, না পুরোটাই কল্পনা?

সে অনেক দিন আগের কথা। গ্যালিলিও দূরবীণ আবিষ্কার করেছেন। দূরবীণে গ্যালিলিও শুক্র গ্রহের পরিবর্তন, শনির বলয়, বৃহস্পতির চাঁদ দেখেছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব বের হয়েছে। চারদিকে মহাকাশ, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে জোর কদমে গবেষণা চলছে।

সে যুগের নামকরা বৈজ্ঞানিক হলেন জিওভান্নি ডোমিনিকো কাসিনি। কাসিনি ছিলেন ফরাসী দেশের লোক। গবেষণার কাজে অনেক ছাত্র প্রয়োজন। একদিন ডেনমার্ক থেকে ওলাফ্ রোমার নামে এক তরুণ কাসিনির কাছে কাজ করতে এলো। চৌকশ ছেলে, যেমন চট্পটে, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি। দিনরাত মানমন্দিরেই পড়ে থাকে রোমার।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে এই ওলাফ্ রোমার একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করে বসল। কি সেই আবিষ্কার?

বৃহস্পতির অনেকগুলি চাঁদের মধ্যে একটি চাঁদের নাম 'আইয়ো'। আইয়ো নিয়মমাফিক বৃহস্পতির চারদিকে ঘোরে। দূরবীণে চোখ লাগিয়ে বৃহস্পতিকে বেশ বড় দেখায়, আইয়োকে ছোট বিন্দু বলে মনে হয়।

এই আইয়ো যখন বৃহস্পতির আড়ালে চলে যায়, তখন শুরু হয় আইয়োর 'গ্রহণ'। যতক্ষণ আইয়ো বৃহস্পতির পিছনে থাকে, অর্থাৎ গ্রহণে আচ্ছন্ন, ততক্ষণ আইয়ো উপগ্রহ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নয়। আইয়ো নিশ্চয় একটি নির্দিষ্ট গতিতে বৃহস্পতিকে পরিক্রমা করে। তার অর্থ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আইয়োর গ্রহণ দেখা উচিত। কিন্তু রোমার আবিষ্কার করল, গ্রহণের সময়ের ব্যবধান নির্দিষ্ট নয়, পরিবর্তনশীল। কি রকম?

ধরা যাক্, জানুয়ারী মাস থেকে আইয়োর গ্রহণ লক্ষ্য করা হচ্ছে। জানুয়ারী থেকে জুন মাস—এই ছ'মাসে যতগুলি গ্রহণ দেখা যাবে, তাদের সময়ের ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, প্রথম গ্রহণ ও দ্বিতীয় গ্রহণের মাঝে যত সময়ের তফাৎ ছিল, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় গ্রহণের মধ্যে তার থেকে বেশি সময়ের পার্থক্য থাকছে। এমনিভাবে, গ্রহণের সময়-ব্যবধান বাড়তির দিকে চলবে। এরপর, জুলাই থেকে ডিসেম্বরের ছ'মাসে যতগুলি গ্রহণ দেখা যাবে, তাদের সময়ের ব্যবধান ক্রমশ কমবে। অর্থাৎ, প্রথম গ্রহণ থেকে দ্বিতীয় গ্রহণ হতে যত সময় নেবে, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় গ্রহণ হতে তার চেয়ে কম সময় নেবে। প্রথম ছ'মাসে আইয়োর গ্রহণ যতটা এগোবে, শেষ ছ'মাসে ঠিক ততটাই পিছোবে। সোজা কথা, রোমারের আবিষ্কারের অর্থ—বছরের প্রথম ছ'মাস আইয়ো তার গতিবেগ ক্রমশ হারিয়ে ফেলে, তারপরের ছ'মাসে তার গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

এটা কি আদৌ সম্ভব ? কোন উপগ্রহ যখন কোন গ্রহর চারপাশে পাক দেয় তখন কি তার গতিবেগের এমন বাৎসরিক পরিবর্তন হতে পারে ? বিজ্ঞানীদের জবাব—মোটেই না। তাহলে ? তাহলে রোমার কি ভুল করেছিল ? ভুল যদি না হয় তবে এ ঘটনার ব্যাখ্যাই বা কি ? এমন হাজার প্রশ্ন সেকালে বিজ্ঞানীদের মনে জেগেছিল।

একদল বিজ্ঞানী বললেন যে কোন বড়সর গ্রহ বা উপগ্রহর টানে আইয়ো তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। স্বাভাবিক পথ হারিয়ে বিপথে বেভুলে আইয়ো এলোমেলোভাবে ছুটছে, বদলে যাচ্ছে তার গতিবেগ। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব ? বৃহস্পতি বা অন্য উপগ্রহগুলির টানাপোড়েনের মধ্যেই তো আইয়োর বাস ; সে কিভাবে ছুটবে, কোন্ পথে যাবে তা তো আগেভাগেই ঠিক হয়ে আছে। অন্য গ্রহ উপগ্রহর টান নতুন নয়। হঠাৎ করে গতিবেগ বদলে যাবেই বা কি করে ?

সবাই যখন এমন নানান ভাবনায় ভাবিত তখন রোমার নিজেই

একেবারে পিলে চমকানো কথা বলল। প্রথমেই, আইয়োর গতি-বেগের তারতম্যের ব্যাপারটা সে উড়িয়ে দিল। রোমার বলল—আলোর গতিবেগ নির্দিষ্ট। তবে, আইয়ো থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাবার সময় কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কারণ, সূর্যের চারপাশে পরিক্রমারত পৃথিবী ও আইয়োর দূরত্ব পরিবর্তনশীল। এক বছর সময়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে নেয়। পৃথিবী একবার আইয়োর থেকে খুব দূরে সরে যায়, একবার কাছে আসে। তাই আইয়ো থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাবার সময়ও বদলে বদলে যায়।

মনে হতে পারে, এ আর নতুন কথা কি? আলো তো একটা নির্দিষ্ট গতিবেগেই দৌড়য়। কিন্তু একটা কথা বলি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন আলোর গতি নিয়ে কারোর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তখনকার দিনে বিজ্ঞানীরা বলতেন, আলো ঈথারের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, ঠিক যেমন বাতাসের মাধ্যমে শব্দ চলাচল করে। এই চিন্তা যে ভুল, তা-ও একদিনে বোঝা যায়নি। আইয়োর গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যাটা ও অন্যান্য কতগুলি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা ঈথার তত্ত্ব বাতিল করে দিলেন। তাঁরা বললেন—না, আলোর স্থানচ্যুতির জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই; আলো শূন্য পথেই চলতে পারে এবং আলোর গতিবেগও নির্দিষ্ট।

এখন কথা হচ্ছে, বৃহস্পতিকে একবার ঘুরে আসতে আইয়োর বেশি সময় লাগে না। এত অল্প সময়ে পৃথিবী তো আইয়ো থেকে খুব একটা দূরে বা কাছে আসে না। সামান্য দূরত্ব বদলের জন্য গ্রহণের সময় কি এতটা বদল হবে? না, সময়ের ব্যবধানটা খুব একটা হবে না, বা এতই কম হবে যে ঘড়িতে ধরা পড়বে না। কিন্তু প্রতিবারই গ্রহণগুলি হয় এগিয়ে, নয় পিছিয়ে হবে। বার বার এমন হতে হতে শেষে সত্যি মাপযোগ্য সময়ের পরিবর্তন ধরা যাবে। ব্যাপারটা এই রকম—

ধরা যাক্‌, একটা ঘড়ি প্রতিদিন দশ সেকেণ্ড ফাস্ট যায়। প্রতিদিন

কি এই সময়ের তারতম্যটুকু ধরা যায়? দশ সেকেণ্ড প্রায় মাপযোগ্য নয় বলে, ঐ পার্থক্যটুকু ধরা যায় না। কিন্তু দিন পনেরো পরে যে মোট আড়াই মিনিট ঘড়ি ফাস্ট হল—তা তো বোঝা যায়। ঠিক এমনি ঘটে আইয়োর গ্রহণের সময়। প্রতি গ্রহণে ঠিক যতটুকু সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে যায় তা মাপা না গেলেও বেশ কয়েকটা গ্রহণের পরে মোট কতটা সময় বদলালো তা তো মাপা যাবে। এইভাবে বছরের প্রথম ছ'মাস পর্যবেক্ষণ করা হল। এই আধ বছর সময়ে পৃথিবী কতটা পথ গেল তা জানা সম্ভব। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আইয়োর দূরত্ব কতটা বদলালো, মাপা গেল। এবার গ্রহণের সময়ের পার্থক্যটুকু মাপা গেলেই আমরা অঙ্ক কষে আলোর গতিবেগ বলে দিতে পারি।

ঠিক। রোমার এই উপায়েই প্রথম আলোর গতিবেগ মাপে। এর আগে আর কেউই আলোর গতিবেগ মাপতে পারেনি। মাপা তো দূরের কথা, আলোর চরিত্রও অন্য কেউ আগে বোঝেনি। রোমারের সেকেলে ঘড়ি, সেকেলের মাপজোকে আলোর গতিবেগ যা পাওয়া গেল তা কিন্তু মোটেই ফেলনা নয়। রোমার মেপে বললো—আলো এক সেকেণ্ডে দু'লক্ষ পনেরো হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। আমরা আজ জানি যে আলোর গতিবেগ—প্রতি সেকেণ্ডে দু'লক্ষ নিরানব্বই হাজার কিলোমিটার।

রোমারের হিসাব তাহলে তত ভুল নয়। অন্তত প্রথম হিসাব বলেই তার একটা আলাদা দাম আছে।

সূর্যের একদিন প্রতিদিন

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স কম নয়, প্রায় তিন হাজার বছর। সেই প্রাচীনকালে, যখন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সবে বিকশিত হচ্ছে তখনই মানুষ গ্রহ ও নক্ষত্রদের মধ্যে তফাৎটা ধরতে পেরেছিল। যে সব গ্রহ খালি চোখে দেখা যায়, অর্থাৎ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—তাদের হদিশ সেকালের মানুষেরা সেই সেকালেই পেয়েছিল।

সাধারণ ভাবে গ্রহ ও নক্ষত্রর মধ্যে পার্থক্য করার পদ্ধতি—গ্রহগুলি আকাশের পটভূমিতে স্থির, অকম্পিত ; কিন্তু নক্ষত্রের আলো কাঁপে, মিট্‌মিট্ করে। গ্রহরা কাছে, কিন্তু নক্ষত্ররা দূরে—তাই গ্রহদের বড় দেখাবে, আর নক্ষত্রদের ছোট বিন্দু বলে মনে হবে। গ্রহ নক্ষত্রের আলো বাতাসের মধ্য দিয়ে আসার সময় প্রতিসরিত হয়ে দিক বদল করে। আর বায়ুপ্রবাহের জন্য বাতাসের ঘনত্ব সব সময়ই বদল হচ্ছে, তাই আলোর গতিমুখও বদল হয় ক্ষণে ক্ষণে। নক্ষত্র বিন্দুসদৃশ বলে, তার থেকে ভেসে আসা আলো দিকবদল করলে, তাকে এক জায়গায় স্থির দেখাবে না, মনে হবে নক্ষত্র কাঁপছে, মিট্‌মিট্ করছে। কিন্তু তুলনায় গ্রহরা বড়, অনেকটা জায়গা থেকে আলো আসছে। প্রতি-সরণের কারণে দিকবদল হলেও, সেই আলোকে স্থানচ্যুত বলে মনে হবে না, কারণ অনেকটা জায়গা থেকে আলো আসছে যে! তাই গ্রহর আলো স্থির।

একটা সহজ পরীক্ষা করলে ব্যাপারটা আরো ভালো বোঝা যাবে। রাতের অন্ধকারে একটা বড় মাঠের এক প্রান্তে একটি টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে মাঠের ওপার থেকে তাকে দেখলে মনে হবে—আলোটা মিট্‌মিট্ করছে। কিন্তু ঐ জায়গায় একটা ফ্লাড লাইট জ্বালালে আর

ঐ আলোকে কম্পিত মনে হবে না। দেখব, আলো ফ্লাড লাইট থেকে সোজা চলে আসছে, তার আসার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই, নেই কোন কাঁপা কাঁপা অস্বস্তি।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবশ্য এভাবে গ্রহ নক্ষত্রদের আলাদা করেন নি। কারণ, বাছাইয়ের কাজে ঐ মিট্‌মিট্‌ করা বা না করার উপর তেমন নির্ভর করা যায় না। দৃষ্টিবিভ্রম তো হতে পারে। তাহলে তারা কিভাবে বুঝেছিল যে মঙ্গল একটি গ্রহ এবং লুব্ধক একটি নক্ষত্র ?

তারা দেখেছিল, রাতের আকাশে কিছু জ্যাতিষ্ক দ্রুত চলাচল করে, কিছু ধীরে। যারা দ্রুত স্থান বদল করে তারাই গ্রহ, অন্যরা নক্ষত্র। ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আকাশের সব জ্যোতিষ্কই স্থান বদল করে। সন্ধ্যার আকাশে যেখানে কোন একটি নক্ষত্র দেখি, শেষ রাতে দেখা যায় তা অন্য জায়গায় সরে গেছে। তা তো হবেই। পৃথিবী নিজে ঘুরছে বলেই এটা সম্ভব। যে কারণে সকালের সূর্য পূর্ব দিকে, আর বিকালে তা সরে পশ্চিমে আসে, ঠিক সেই কারণে গ্রহ নক্ষত্র চাঁদ—সবার উদয় আছে, অস্ত আছে। সূর্য গ্রহ নক্ষত্রর এই 'আহ্নিক সরণ' ছাড়াও আরো এক রকমের সরণ আছে। লক্ষ্য করলে দেখব, আজ রাত বারোটায় আকাশের কোন একটি নক্ষত্র যেখানে আছে, কাল রাত বারোটায় সেখানে নেই, একটু সরে গেছে। আজ দুপুর বারোটায় সূর্য আকাশের যেখানে আছে, কাল দুপুর বারোটায় সেখানে থাকবে না, একটু সরে যাবে। আর গ্রহ ? আজ রাত বারোটায়, ধরা যাক, মঙ্গল গ্রহ আকাশে যেখানে আছে, কাল রাত বারোটায় তার থেকে অনেকটা দূরে চলে যাবে। একটি নক্ষত্রের সরণের থেকে গ্রহর সরণ বেশিই হবে।

এখন প্রশ্ন হল, কেন গ্রহ নক্ষত্ররা কম বেশি স্থান বদল করে ? আজ রাত বারোটায় ঠিক আমার মাথার উপর একটি নক্ষত্র অবস্থান করছে। ঐ নক্ষত্র থেকে আগত আলোর রেখা আমার মাথার উপর

পড়ে তারপর পৃথিবীর মাটিকে লম্বভাবে স্পর্শ করে। চব্বিশ ঘণ্টা পর, মহাকাশের পটে পৃথিবী কিছুটা সরে যাবার দরুন (যেহেতু পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করছে), ঐ নক্ষত্রটি আর আমার মাথার উপর থাকবে না। বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিই। একটা চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে একটি ছোট ছেলে খেলাচ্ছলে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খেতে খেতে সে একবার, গাড়ির জানালার ওপাশে মাঠে একটা নারকেল গাছ দেখতে পেল। তারপরের একপাক শেষ হবার পর আর তার চোখে ঐ নারকেল গাছ পড়বে না, কারণ ওই একপাক দেবার সময়ের মাঝে গাড়ি যে আরো কিছুটা এগিয়ে গেছে !

আজ রাত বারোটা থেকে পরের দিন রাত বারোটার মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য, কিন্তু নিজ অক্ষে একটা সম্পূর্ণ পাক দিতে পৃথিবীর প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময় লাগে। মাত্র চার মিনিটের ফারাক। আজ রাত বারোটায় যেখানে একটি নক্ষত্র দেখছি, কাল রাত ১১টা ৫৬ মিনিটে ঐ নক্ষত্রটিকে ঠিক ঐ স্থানে দেখব, পরের দিন রাত ১১টা ৫২ মিনিটে আবার তাকে ওখানে দেখব। এইভাবে দিনের পর দিন, একটি নির্দিষ্ট সময় কোন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করলে, তার অবস্থানের পরিবর্তন দেখব। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে বলেই আকাশের পটে তাদের অবস্থান বদলানো দেখা যাবে। নক্ষত্রের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবার সূর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক।

সূর্যও একটি নক্ষত্র। তাই দিনে দিনে সূর্যের অবস্থানের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন পৃথিবী তার সূর্যের চতুঃপার্শ্বের আবর্তন-পথ ধরে একটু একটু এগিয়ে যায়। তার ফলে সূর্যের পশ্চাদপটের ছবিটাও বদলে যায়। যদি কোনভাবে সূর্যের আলোর ছটা বন্ধ করা যেত, তবে সূর্যের পিছনে যে সব নক্ষত্ররা আছে তাদের দেখা যেত। কোন্ নক্ষত্রের পটভূমিকায়, কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলীতে (constellation) সূর্য বিরাজ করছে তা-ও বোঝা যেত। দিনে দিনে সূর্যের নক্ষত্র-খচিত

পশ্চাদদৃশ্য বদলে যাবে। বিষয়টা ভালো করে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিই।

ধরা যাক, একটি থিয়েটার-স্টেজের পিছনে সারি সারি ফুল পাতা পশু পাখি আঁকা একটি 'সিন' টাঙানো আছে। স্টেজের মাঝে একটা আলো জ্বলছে। এবার, স্টেজের সামনে এসে কোন দর্শক যদি আলোর দিকে তাকিয়ে স্টেজের এক পাশ থেকে অন্য পাশে এগিয়ে যায়, তবে সে ঐ আলোর রেখা বরাবর 'সিনে' আঁকা ছবিগুলিকে বদলে যেতে দেখবে। একবার চোখের সামনে ফুল দেখবে। একবার পাতা দেখবে। একবার পাখি। একবার পশু—এই রকম।

ঠিক একই ব্যাপার সূর্যের বেলায় ঘটে। পৃথিবী মহাকাশে চলমান বলে, প্রতিদিন পৃথিবীর পিঠে চড়ে আমরা যখন সূর্যকে দেখি, তখন তার পিছনের নক্ষত্রখচিত আকাশের ছবিটা, আগের দিনের থেকে সামান্য বদলে যায়; একমাস অন্তর অন্তর দেখলে ঐ নক্ষত্রভরা পশ্চাদ-দৃশ্য অনেকটা যে বদলে গেছে তা বেশ বোঝা যায়। অবশ্য, সূর্যের আলোর দাপটে আমরা ঐ ছবি সরাসরি দেখতে পাইনা। তাহলে সূর্য যে নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবস্থান করছে তার ছবিটা কেমন, তা বুঝবো কি করে?

আগেই বলেছি যে প্রতিদিন নক্ষত্র প্রায় চার মিনিট সময়ের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, ৩০ দিন বা এক মাসে নক্ষত্র ১২০ মিনিট বা দু'ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে এগিয়ে আসে। আজ রাত দশটায় যে নক্ষত্রকে যেখানে দেখছি, একমাস পরে রাত আটটায় ঐ একই স্থানে ঐ নক্ষত্রটি দেখব। ছ'মাস পরে বারো ঘন্টা আগে, অর্থাৎ সকাল দশটায় ঐ নক্ষত্রটি আকাশের ঐ স্থানে থাকবে। অবশ্য সকাল দশটায় সূর্যের দাপটে নক্ষত্রটি দেখা যাবে না। দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। এখন, ঐ বিশেষ নক্ষত্রটি বা নক্ষত্রমণ্ডলী ছ'মাস পরে সকাল দশটায় সূর্যের পিছনে পড়লে আমরা তৎকালীন সূর্যের নক্ষত্র-পটভূমি জানতে পারি। এককথায়, আজ সকাল দশটায়

সূর্য আকাশের যেখানে আছে, ছ'মাস আগে রাত দশটায় আকাশের ঠিক ঐ স্থানে যে নক্ষত্রমণ্ডলী ছিল—তাই-ই বর্তমান সূর্যের পশ্চাদ-নক্ষত্রমণ্ডলী।

সূর্য এভাবে সারা বছর ধরে এক নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলীতে সরে সরে যায়। ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীতে যে সব নক্ষত্র আছে তাদের একটা কাল্পনিক রূপ দেওয়া যায়। কোনটি মেষ, কোনটি বৃষ, কোনটির কুম্ভ আকার। এরকমভাবে সূর্যের সারা বছরের আবর্তন পথকে বারোটি কল্পিত চিত্রে বিভক্ত করা যায়। এসব ছবি হল—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এদের 'রাশি' বলে। সূর্য সব সময় কোন না কোন রাশিতে অবস্থান করে।

শুধু সূর্য নয়, চন্দ্র ও গ্রহরা একরাশি থেকে অন্যরাশিতে সরে যায়। চন্দ্র আমাদের পৃথিবীকে আবর্তন করে, গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তাই রাশিচক্রে এদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা কিছুটা জটিল হবে বলে এখানেই থামছি। পরে সুযোগ মতো এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ভুতুড়ে গ্রহ

শিরোনাম দেখে চমকে উঠতে হয়।

ভুতুড়ে গ্রহ আবার কি? যে গ্রহে ভুত বাস করে? কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভুত মানেন না। তাহলে কি,- একদা এক গ্রহ সশরীরে ছিল, তারপর লুপ্ত হয়েছে, তাকেই কি বলি ভুতুড়ে গ্রহ? তা-ও নয়। 'ভুতুড়ে গ্রহ' মানে—যে গ্রহ আদৌ ছিল না। কিরকম?

অনেক দিন আগের কথা। ইউরেনাস গ্রহর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন—সূর্যের চারপাশে ইউরেনাসের প্রদক্ষিণ পথ কেমন যেন এলোমেলো, যতটা বক্রতা যেখানে থাকার কথা, তা নেই। নেশাগ্রস্ত মানুষ যেমন হাঁটতে হাঁটতে পথ ছেড়ে টলমল পায়ে বিপথে যায়, ঠিক তেমনি ইউরেনাসও বাঁধা পথের পথিক হয়ে থাকতে চায় না। বিজ্ঞানীরা বললেন, নিশ্চয়ই কোন বড়সর গ্রহ ইউরেনাসকে টানছে, গোপন মাধ্যাকর্ষণ বল ইউরেনাসকে পথচ্যুত করছে। মহাকাশ আতি-পাতি করে খুঁজে দেখা গেল—ঠিক। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একটি নতুন গ্রহর আবিষ্কার হল, নাম হল 'নেপচুন'। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করল।

ইউরেনাসের বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন ফরাসী জ্যোতির্বিদ আরবাঁ জাঁ জোসেফ লেভারিয়ে। নেপচুন-আবিষ্কারের সাফল্যে খুশী হয়ে লেভারিয়ে মহাকাশের আরো কয়েকটি সমস্যার দিকে মন দিলেন।

এরকম একটি সমস্যা—বুধ গ্রহের পথচ্যুতি। বুধ কিন্তু ইউরেনাসের মতো এলোমেলো পা ফেলে না, বরং তার সূর্য-পরিক্রমার পথে যে বিচ্যুতি আছে তাতে কিছুটা ছন্দ আছে, কিছুটা নিয়মও আছে। আমরা সবাই জানি, গ্রহগুলি সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করে।

উপবৃত্ত একটি লম্বাটে পথ, ডিমের মত, তার তু'পাশ চাপা, বাকি তু'পাশ ছড়ানো। স্বভাবতই, এরকম পথে চলার দরুন বুধ কখনও সূর্যের কাছে আসে, কখনও দূরে চলে যায়। উপবৃত্তের একটি নাভিতে সূর্য অবস্থান করে। বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই পথের উপর যে বিন্দু সূর্যের নিকটতম, অর্থাৎ যাকে আমরা অনুসূর বিন্দু বলি, তার কিছুটা সরণ আছে। প্রতি সূর্য-পরিক্রমার শেষে (অর্থাৎ বুধের এক বছর) বুধ আগের অনুসূর বিন্দুতে ফিরে আসে না, নতুন অনুসূর বিন্দুটি পুরনো অনুসূর বিন্দু থেকে সামান্য সরে যায়। এইভাবে বুধের সূর্য-পরিক্রমা চলছে মহাকালের সেই অতীত থেকে, আর প্রতিবারই অনুসূর বিন্দুটি একটু একটু করে বিচ্যুত হচ্ছে।

কেন এই বিচ্যুতি? লেভারিয়ে ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোন অজানা গ্রহ বুধকে টানছে। যেমন নেপচুনের টান ইউরেনাসকে পথচ্যুত করে, তেমনি নিশ্চয়ই বুধের কাছাকাছি কোন গ্রহ বুধকে ধরে টানাটানি করছে। অবশ্য বুধের কাছে শুক্র আছে, পৃথিবী আছে, মঙ্গল আছে, চাঁদও আছে। অঙ্ক কষে দেখা গেল যে এদের সম্মিলিত টান ঐ পথচ্যুতিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

লেভারিয়ে প্রস্তাব দিলেন যে অজানা গ্রহটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ। দেবতাদের নামে তার নামকরণ হল—'ভালকান'। অঙ্ক কষে লেভারিয়ে বললেন,—ভালকান সূর্য থেকে তুশ দশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, প্রায় বিশ দিনে সে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

এরপর শুরু হল ভালকানের আবিষ্কার পর্ব। কাজটা মোটেই সহজ নয়। ভালকান সূর্যের কোলের গ্রহ বলে সে সব সময় সূর্যের কাছাকাছি থাকবে। দিনের বেলায় সূর্যের দিকে তো তাকানো যায় না, দীপ্ত রবিচ্ছটায় ভালকানকে দেখা অসম্ভব। একেবারে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়, যখন সূর্য কোমল স্নিগ্ধ, তখনই সূর্যের কাছাকাছি ভালকানকে চোখে দেখলেও দেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা দূরবীণে চোখ রাখলেন। মাঝে মাঝে সংবাদ এলো

দেখা গেছে, দেখা গেছে ভালকানকে। এক জ্যোতির্বিদ ডাঃ লেকার্বালো একদিন বললেন, তিনি ছোট্ট ভালকানকে অস্তগামী সূর্যের থালার উপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছেন। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু না, সবটাই গুজব। ভালকান যেমন গোপন ছিল তেমন গোপনেই রয়ে গেল। রহস্যময় ভালকান লেভারিয়েকে চিরদিন হাতছানিই দিয়ে গেল, ধরা দিল না।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেভারিয়ে ভগ্ন মনোরথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। লেভারিয়ের মৃত্যুর পরও ভালকানকে ধরার চেষ্টার বিরাম হল না। কিন্তু সব পরিশ্রম বৃথা গেল। ভালকান রহস্য হয়ে রইল। কেউ বললেন, —ভালকান অভিশপ্ত, কেউ বললেন—ভালকান ভুতুড়ে গ্রহ।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা ভালকানের আশা ছেড়ে দিলেন। তাঁরা বললেন--ভালকান অলীক, মায়ামৃগ।

কিন্তু বুধের পথচ্যুতি? তা তো অলীক নয়। ভালকান যদি অলীক হয়, তাহলে বুধের পথচ্যুতির ব্যাখ্যা কি? একটা বিরাট প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন বিজ্ঞানীদের সামনে ঝুলে রইল।

উনবিংশ শতাব্দী চলে গিয়ে বিংশ শতাব্দী এলো। আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ জন্ম নিল। নিউটনের মাধ্যা-কর্ষণ তত্ত্বকে নতুন করে দেখা হল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আলোয়। আপেক্ষিকতাবাদ বলল—ভর ও শক্তি মূলত অভিন্ন। ভর ও শক্তি পরস্পর বিনিময়যোগ্য। শক্তিকে ভর রূপে দেখা যায়, আবার ভরকেও শক্তি বলা চলে।

আইনস্টাইন বললেন, বুধ গ্রহ সূর্যের অতি নিকটে থাকায় সে অবিরাম সূর্য রশ্মিতে স্নান করছে। বিশেষ করে বুধের পথের অনুস্মূর বিন্দুটি সূর্যের খুব কাছে, এজন্য ঐ স্থানে সূর্যের আলোক শক্তির প্রাচুর্যও বেশি। সূর্যের বিপুলাকায় ভর বুধের অনুস্মূর বিন্দুতে দেশ ও সময়ের বিচ্যুতি করছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বুধের পথ-

চ্যুতির একটি ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন।

আইনস্টাইন আমাদের বাঁচালেন, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে রক্ষা করলেন, বুধ-সমস্যা সমাধান করলেন। আমরা আপেক্ষিকতাবাদের জয়ধ্বনি দিলাম।

কিন্তু……

আবার কিন্তু কেন? কিন্তু এই জন্য যে, কিছুকাল আগে মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট হেনরী ডিকে বিজ্ঞানীদের আসরে একটি বোমা ফাটিয়েছেন। এক কথায়, তিনি আপেক্ষিকতাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। ব্যাপারটা বলি।

সূর্য আর পাঁচটা গ্রহ নক্ষত্রর মত নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। সৌরকলঙ্কের গতিবিধি দেখে তা বোঝা গেছে। এই ঘোরার দরুণ সূর্যের পেটের দিকটা সামান্য ফুলে আছে। এদিক থেকে সূর্যের চেহারাটা কমলালেবু মার্কা পৃথিবীর মত। ডিকে অঙ্ক কষে বললেন যে, ঐ যে সূর্যের পেট একটু ফুলে আছে, তাতে সূর্য যতটুকু বহির্মুখী, তাতেই বুধের পথচ্যুতি হবে।

অতঃ কিম?

আধুনিক বিজ্ঞানীরা মহা সমস্যায় পড়েছেন। শ্যাম রাখি না কূল রাখি। একদিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, অন্যদিকে ডিকের ব্যাখ্যা। আপেক্ষিকতাবাদকে যেমন অগ্রাহ্য করা যায় না, তেমনি ডিকের ব্যাখ্যা তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না, তার পিছনেও যথেষ্ট বিজ্ঞান আছে।

সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। আর তা তো স্বাভাবিক। কারণ, সমস্যা না থাকলে বিজ্ঞান মৃত হয়ে যাবে। দেখা যাক। ভবিষ্যতই আইনস্টাইন বনাম ডিকের খেলায় শেষ হুইসেল বাজাবে।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !

কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র মিলে এই ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে। এক জ্যোতিষ্ক থেকে অন্যের দূরত্ব অপরিসীম। বিশ্বের দ্রুততম গতিবেগ নিয়ে আলো ছুটছে, সেই আলোও এক নক্ষত্র থেকে যাত্রা করে অন্য নক্ষত্রর দ্বারে পৌঁছয় বছর পেরিয়ে, কখনও বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

ধরা যাক, আমাদের নিকটতম নক্ষত্র সূর্যের কথা। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত, মঙ্গলের দূরত্ব কত, আলফা-সেন্টাউরি নক্ষত্রের দূরত্ব কত—তা আমরা জানি। কিভাবে জানলাম ? কিভাবে মাপলাম ?

এ তো ঠিক যে লম্বা ফিতে ফেলে মহাকাশের দূরত্বগুলি মাপা যায় না। তাহলে জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মাপার উপায় কি ?

অনেকদিন আগে, গ্রীস দেশের এরাটোস্‌থেনেস পৃথিবীর ব্যাস মেপেছিলেন। পৃথিবীর বক্রতা মেপে তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইল দীর্ঘ। সেই থেকে, এই আট হাজার মাইল তথ্যের উপর নির্ভর করে, নানান গ্রহ নক্ষত্রর দূরত্ব মাপার কাজ শুরু হয়। কিভাবে ?

একটা উদাহরণের সাহায্যে আলোচনাটা শুরু করা যাক। একটা খোলা মাঠের মাঝে একটি খুঁটি পোঁতা আছে। মাঠের ওপারে দূর দিগন্তে আবছা বন দেখা যাচ্ছে। এইবার কোন দর্শক, মাঠের যেদিকে বন, তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে খুঁটিটাকে লক্ষ্য করছে। খুঁটিটা দেখার সময়, দর্শক খুঁটির পশ্চাদভূমি বনের একটা অংশ দেখতে পাবে। দর্শক ও খুঁটি বরাবর যে সরলরেখা—তা পিছন দিকে বাড়িয়ে দিলে, বনের যে অংশে ঐ রেখা গিয়ে মিলবে, তাই-ই দর্শক পশ্চাদভূমি

হিসাবে দেখবে। এরপর, দর্শক একটু বাম দিকে বা ডান দিকে সরে গেলে, সে নতুন অবস্থান থেকে খুঁটিটাকে দেখবে এবং পশ্চাদভূমি বনের একটা নতুন অংশ তার চোখে পড়বে। দর্শক ও খুঁটি বরাবর সরলরেখাটি আগের অবস্থানের দর্শক ও খুঁটি বরাবর সরলরেখাকে ছেদ করে পরস্পরের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করবে।

দর্শকও খুঁটির মাঝের দূরত্ব স্থির রেখে, দর্শকের নিজের দুই অবস্থানের মধ্যে যত দূরত্ব বেশি হবে, ততই ঐ কোণের মাপ বাড়বে। আবার, দর্শকের নিজের দুই অবস্থান স্থির রেখে, দর্শক থেকে খুঁটির দূরত্ব যত কমবে, ততই ঐ কোণের মাপ বাড়বে।

এভাবে, পৃথিবীতে দু'জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন জ্যোতির্বিদ যদি কোন একটি জ্যোতিষ্ককে (ধরা যাক, বৃহস্পতি গ্রহ) লক্ষ্য করেন তবে তিনি দেখবেন যে, দর্শনের স্থান পরিবর্তনের দরুন, তাঁর দৃষ্টিপথের পশ্চাতে মহাকাশের নক্ষত্রর পটভূমি বদলে গেছে। দু'টি দৃষ্টিপথের মাঝের কোণের মাপ নেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কোণের মাপ কম হলে বোঝা যাবে যে জ্যোতিষ্কটি দূরের। কোণের মাপ বেশি হলে বুঝব যে জ্যোতিষ্কটি পৃথিবীর কাছে অবস্থান করছে। কোণের মাপ এবং দুই জ্যোতিষ্ক-দর্শনের দূরত্ব মাপতে পারলে অঙ্ক কষে ঐ জ্যোতিষ্কর দূরত্ব বলে দেওয়া যেতে পারে।

এভাবে কোন জ্যোতিষ্কর দূরত্ব মাপার পদ্ধতির নাম 'লম্বন' (parallax) পদ্ধতি। চাঁদের লম্বন মেপেছিলেন ক্লডিয়াস টলেমি। লম্বনের মাপ নিয়ে অঙ্ক কষলেন টলেমি, তারপর বললেন – পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার। বহির্পৃথিবীর গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রগুলির লম্বনের কোণ খুবই ছোট হবে; এত ছোট যে তা মেপে ওঠাই মুস্কিল। জ্যোতির্বিদ যে দু'টি জায়গায় দাঁড়িয়ে লম্বন মাপছেন, তাদের দূরত্ব যত বেশি হবে ততই এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। লম্বনের মাপ নেবার জন্য যদি এমন দুটি মানমন্দির বেছে নেওয়া হয়, যার একটি

অন্যটির ঠিক বিপরীত দিকের পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থান করছে, তাহলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। এই অবস্থায়, মানমন্দির দুটির দূরত্বের মাপ আট হাজার মাইল, যা পৃথিবীর ব্যাসের সমান। এভাবে যে লম্বন মাপা হয় তার অর্ধেক মাপের নাম 'ভূকেন্দ্রিক লম্বন (geocentric parallax)। অর্থাৎ দর্শকের দুই অবস্থানের দূরত্বকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান ধরে নিয়ে যে লম্বন পাওয়া যায়, তাই ভূকেন্দ্রিক লম্বন।

ক্লডিয়াস টলেমি চাঁদের দূরত্ব মেপেছিলেন সেই সেকালে, খ্রীষ্টের জন্মেরও আগে। তারপর লম্বনের সাহায্যে সূর্য ও অন্য গ্রহর দূরত্ব মাপার চেষ্টা হয়। কিন্তু লম্বনের কোণের মাপ এতই কম যে তা মাপা প্রায় অসম্ভব ছিল! গ্যালিলিও-র সময় থেকে বিজ্ঞানের নবজন্ম হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা অগ্রগতি লাভ করে এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। সে সময় সূর্যের দূরত্ব মাপা হল, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯২৯৬৫০০০ মাইল। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিদ জিওভান্নি কাসিনি মঙ্গল গ্রহর লম্বন মাপেন, এর পর পর অন্যগ্রহ, যথা শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোর লম্বন মেপে তাদের দূরত্বের হিসাব নেওয়া হয়।

সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহর দূরত্ব মাপার পর সৌরজগতের ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেলাম। সূর্যের সংসার কত বড় তা জানতে পেরে মানুষ অবাক হল। গ্রহ উপগ্রহগুলির বিচ্ছিন্নতা আমাদের বিস্মিত করেছে।

কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানে নয়। এরপর বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল—কিভাবে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে এত দূরে যে তাদের লম্বনের মাপ নেওয়া প্রায় অসম্ভব, অতিমাত্রায় সংকীর্ণ সেই লম্বন-কোণ।

এমন অসম্ভবকেও সম্ভব করা হয়েছিল। দু'দিকে নজর দেওয়া হল – দূরবীণের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বাড়ানো হল এবং লম্বন মাপার জন্য জ্যোতির্বিদের দুই অবস্থানের মধ্যের দূরত্ব বাড়ানো হল। কিভাবে

দূরত্ব বাড়ানো যায়? ভূকেন্দ্রিক লম্বন মাপার সময়ই তো সর্বাপেক্ষা দূরত্ব (পৃথিবীর ব্যাস) নেওয়া হয়েছিল। তাহলে?

অঙ্কবিদ্‌রা বললেন,—একটা উপায় আছে। পৃথিবী তো প্রায় বৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমা করে। আজ যদি কোন নক্ষত্রকে দেখা হয়, ছ'মাস পরে, পৃথিবী যখন সূর্য-পরিক্রমা পথের আর একপাশে হাজির হবে, সেখান থেকে আবার ঐ নক্ষত্রকে দেখা যেতে পারে। এই দুই অবস্থানের মাঝের দূরত্বের মাপ হল—পরিক্রমা পথের যা ব্যাস, তাই। সূর্য-পরিক্রমা পথের ব্যাস ১৯ কোটি মাইল, তাই ছয় মাস আগে পরে দেখা কোন নক্ষত্রের লম্বনের মাপ পেতে হলে অবশ্যই জ্যোতির্বিদের দুই অবস্থানের মাঝের দূরত্বকে ১৯ কোটি মাইল ধরতে হবে। আর কে না জানে যে এই দূরত্ব বাড়ার জন্য লম্বনের কোণের মাপ বাড়বে। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমা বৃত্তের ব্যাসার্ধকে দর্শকের দুই অবস্থানের দূরত্ব ধরে নিয়ে যে লম্বন মাপা হয় তার নাম 'বার্ষিক লম্বন' (annual parallax)।

এভাবে বিজ্ঞানীরা প্রথমে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র (সূর্য বাদে) আলফা-সেণ্টাউরির দূরত্ব মাপেন। আলফা-সেণ্টাউরির দূরত্ব ২৪,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল!

আলো এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ১৮৬০০০ মাইল পথ পাড়ি দেয়। সুতরাং এক বছর ধরে আলো পাড়ি দেবে ১৮৬০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল। এই দূরত্বের নাম—'এক আলো বছর'। হিসাব করলে দেখা যাবে যে আলফা-সেণ্টাউরি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 'চার আলো বছর'।

বিজ্ঞান তারপর আরো এগিয়ে চলল। আরো দূর, আরো দূরের নক্ষত্রের দূরত্ব মাপা হল। আমাদের নিজস্ব তারাজগতের ব্যাসের মাপ ১০০,০০০ আলো বছর। এরকম কোটি কোটি আলো বছর দূরত্বে কোটি কোটি তারাজগত ছড়িয়ে আছে। ভাবা যায় কি কল্পনাতীত দূরত্ব? অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কাছে মানুষের কল্পনাও হার মানে। সত্যি, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!

ভরে ভরে টানাটানি

মহাকাশের দুনিয়ায় যার যত ওজন তার তত গায়ে জোর। সূর্য ভরের জোরে গ্রহকে টেনে রাখছে, গ্রহ উপগ্রহকে বেঁধে ফেলেছে, উপ-গ্রহর টানে উল্কা এসে তার উপর আছড়ে পড়ছে।

অনেক, অনেকদিন আগে আইজ্যাক নিউটন এই টানাটানির ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নিউটনের বাগানে আপেল পড়ার গল্প সবাই জানে।

বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। সূর্য গ্রহকে, গ্রহ সূর্যকে, পৃথিবী আপেলকে, আপেল পৃথিবীকে—এমনি কত! এই টানাটানির লড়াইয়ে যার যত ভর, অর্থাৎ যত বস্তু সামগ্রী তার তত প্রাধান্য। পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের থেকে বেশি, পৃথিবীর টানও বেশি। তাই পৃথিবীতে যে পাঁচ ফুট হাইজাম্প দেয়, সে-ই চাঁদে প্রায় ত্রিশ ফুট লাফ দেবে।

প্রথমে পৃথিবীর কথা বলি। আমাদের পৃথিবীর ভর ৬×১০^{২৪} কিলোগ্রাম। পৃথিবী আকারে গোলক, তার ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলো-মিটার। পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ জেনে নিয়ে পৃথিবীর ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর গড় ঘনত্ব—প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫·৫ গ্রাম।

পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে এক কিলোমিটার উপরে রাখা এক কিলোগ্রাম ভরের কোন বস্তুকে পৃথিবী যত জোরে টানবে, সেই বস্তুকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে রাখলে অবশ্যই তার থেকে জোরে টানবে। কেন? নিউটনের মাধ্যা-কর্ষণের নিয়ম অনুসারে, মাধ্যাকর্ষণজাত আকর্ষণ বল বস্তু-দ্বয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতী অর্থাৎ দূরত্ব কমলে মাধ্যাকর্ষণ টান বাড়বে।

এবার ধরা যাক, কোন উপায়ে আমরা পৃথিবীকে খানিকটা সংকুচিত

করে ফেললাম। পৃথিবীর ভর ঠিক রইল, ব্যাসার্ধ কমলো, ঘনত্ব বাড়ল। গোলাকার বস্তুর সমস্ত ভরকে তার কেন্দ্রে সমর্পিত করা যায়—এই ধারণা অনুযায়ী আমরা বলবো যে, সংকুচিত অবস্থায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ তার কেন্দ্রের আরো নিকটে এসেছে, অর্থাৎ সংকুচিত পৃথিবীর পৃষ্ঠে রাখা ঐ এক কিলোগ্রাম ভরের বস্তুখণ্ডকে পৃথিবী আগের থেকে আরও জোরে টেনে রাখবে।

পৃথিবীকে যত সংকুচিত করা হবে, ততই তার পিঠে রাখা বস্তুর উপর পৃথিবীর টান বাড়বে। যত এই মাধ্যাকর্ষণের টান বেশি হবে, তত বস্তুখণ্ডকে গ্রহর পিঠ থেকে টেনে উপরে তোলা শক্ত হবে। এই বিষয়টির সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত।

জলের মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় ভারি জিনিসকে টানাটানি করা সহজ। কারণ, পৃথিবীর নিচের টানকে জলের উপরমুখী অভিঘাত কমিয়ে দেয়। পৃথিবীর আকর্ষণের টানে ঘাটতি পড়ায় ডুবন্ত বস্তুকে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। মহাকাশের গভীরে, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই বা জিরো গ্রাভিটি সেখানে তো চলা ফেরা, জিনিস তোলা একেবারে সহজ। একেবারে ভারহীন, লঘু, পাখির পালকের মত ফুরফুরে মনে হবে নিজেকে।

পৃথিবীর প্রসঙ্গ ছেড়ে নক্ষত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি। যে কোন নক্ষত্রের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় অনেক বেশি, তাই নক্ষত্রদের মাধ্যাকর্ষণের টানও বেশি। নক্ষত্র যদি কোন কারণে সংকুচিত হয় তাহলে তার পৃষ্ঠদেশের উপরে রাখা বস্তুর উপর টান আরো আরো বেশি হবে। ভারী ভারী নক্ষত্রের জীবনে নানারকমের পরিবর্তন আসে, কখনও নক্ষত্র ফুলে ফেঁপে রক্তিম আকার ধারণ করে, যেন সে একটি লোহিত দানব। কখনও সংকুচিত হয়ে শ্বেতভাস্বর হয়, যেন সে একটি ক্ষুদ্রকায় শ্বেত বামন। যদি সংকোচন চলতেই থাকে তাহলে তা ক্ষুদ্রকায় বর্তুলাকার ধারণ করে, মহাকাশে দেদীপ্যমান নক্ষত্রপিণ্ড, অসাধারণ তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অসাধারণ তার ঘনত্ব। তেমন নক্ষত্রের এক ঘন সেন্টিমিটার পদার্থের ওজন হবে $১০^{১২}$ গ্রাম! ভাবতে পারা

যায়, কি নিরেট সেই পদার্থ? আমাদের পৃথিবীতে এমন নিরেট পদার্থের কথা চিন্তাই করতে পারি না। অমন নিরেট পদার্থের একটা পাথরের টুকরোকে পৃথিবীর বলশালী লোকও তুলতে ব্যর্থ হবে।

যাই হোক, নক্ষত্রের সেই অসাধারণ দশায়, তার পৃষ্ঠদেশে মাধ্যাকর্ষণের টান এত তীব্র হবে যে আলোক কণিকাও সেই টান অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে আসতে পারবে না। বস্তুখণ্ড, গ্যাসীয় পদার্থ—এরা তো দূরের কথা, যে আলোক কণিকা সেকেণ্ডে ৩ × ১০^১০ সেন্টিমিটার বেগে ছুটতে পারে, তার পক্ষেও সেই অমোঘ টান অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আলো তো শুধু তরঙ্গ নয়, তার বস্তুকণার বৈশিষ্ট্য আছে। জটীল অঙ্ক সমাধান করে আলোক কণিকার ভর নির্ণয় করা সম্ভব। আলোক কণিকার দুরন্ত গতিবেগও তাকে ঐ মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করতে পারবে না, পাবে না সেই মুক্তিবেগ।

তারপর?

নক্ষত্র থেকে যদি আলো বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে সেই নক্ষত্র কি দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে? আদৌ নয়। দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো, তার দু'পারে প্রসারিত অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মি, এমন কি গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি—সবাই শুধু মাথা কুটে মরবে, নক্ষত্রের বাঁধন ছিঁড়ে মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। না যায় চোখে দেখা, না যায় আলোক-যন্ত্রে মাপা—এমন ভয়াবহ নক্ষত্রের নাম 'কৃষ্ণ গহ্বর'। এ যেন মৃত্যু গহ্বর, একবার তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই, কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

মহাকাশে এমন কৃষ্ণ গহ্বর হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে। কৃষ্ণ গহ্বরগুলি আসলে মৃত নক্ষত্র। একমাত্র তাদের অমোঘ বলশালী-মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কাছাকাছি গ্রহ নক্ষত্রের চলন পথের পরিবর্তন দেখে তাদের অবস্থান বোঝা যায়। অনেকের অনুমান, আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে একটি অতিকায় কৃষ্ণ গহ্বর আছে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর প্রথম 'কৃষ্ণ গহ্বরের' অস্তিত্ব গাণিতিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি পরে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

চাঁদ যদি না থাকত

চাঁদ যদি না থাকত তো কি হত ?

এককথায়,—আমরা জ্যোৎস্না পেতাম না, গ্রহণ দেখতাম না, পৃথিবীর একটি দিন চব্বিশ ঘণ্টায় না হয়ে হয়ত বিশ ঘণ্টায় হত—আরো কত কি। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, আমরা জন্মতামই না। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের পিছনে চাঁদের একটি অবদান আছে। জোয়ার-ভাঁটা না থাকলে জলজ আদিম প্রাণ কি বিকশিত হতে পারত ? আর কে না জানে যে চাঁদের জন্যই জোয়ার-ভাঁটা হয়।

জোয়ার-ভাঁটার পিছনে যে চাঁদের হাত আছে তা মানুষের বুঝে উঠতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। সেই আদিমকাল থেকে মানুষ জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করেছে, নৌ-অভিযানে জোয়ারের বেগ, ভাঁটার টান কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু কেন জোয়ার-ভাঁটা হয়, তা বুঝে উঠতে অনেকদিন সময় লেগেছিল।

শেষে, সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন আইজ্যাক নিউটন। বুঝলাম, চাঁদের টানে পৃথিবীর যে দিকে জল ফেঁপে ওঠে, সেদিকে জোয়ার হয়। কিন্তু, পৃথিবীর যে দিকে চাঁদ সে দিকে চাঁদের টানে জোয়ার হলেও, ঠিক তার বিপরীত দিকে তখনই আর একটা জোয়ার হয় কেন ? সে দিকে তো টানার কেউ নেই (বিশেষ করে অমাবস্যার দিনে)। তাহলে পৃথিবীর দু-পিঠে একই সঙ্গে জোয়ার হচ্ছে কেন ?

আরো প্রশ্ন করি। চাঁদ যদি না থাকত তাহলে কি একেবারেই জোয়ার-ভাঁটা হত না ? বায়ুমণ্ডলে কি জোয়ার-ভাঁটা হয় ? পুকুরের জলে কি জোয়ারের টান আসে ?

পৃথিবীর ব্যাসের মাপ ১২৭৫৬ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে চাঁদের

দূরত্ব ৩৮৪০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বটি, পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় প্রায় ত্রিশগুণ বেশি। মহাকাশের তুনিয়ার হিসাবে, এই তুটি মাপের পার্থক্যটি খুবই কম। সেজন্য, পৃথিবীর তুপিঠে রাখা তুটি বস্তুর উপর চাঁদের আকর্ষণে তফাৎ হবে বিস্তর। চাঁদের দিকে ফিরে থাকা পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থিত কোন বস্তু কণাকে চাঁদ বেশ জোরে টানবে, কিন্তু উল্টোদিকের পৃথিবী-পৃষ্ঠে বসানো ঐ রকমের কোন বস্তুকে চাঁদ হালকা টানে টানবে। এ কথা কে না জানে যে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুয়ায়ী—তুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যত বাড়বে তত তাদের মধ্যকার আকর্ষণ কমবে। কলকাতার মাথার উপরে যদি চাঁদ থাকে তবে চাঁদ কলকাতার মানুষকে জোরে টানবে। কলকাতার প্রায় বিপরীত পৃষ্ঠে আছে নিউইয়র্ক শহর, ঐ নগরীর মানুষের উপর কম করে চাঁদের টান পড়বে। আবার নিউইয়র্কের মাথার উপর চাঁদ থাকলে তা নিউইয়র্কের বস্তুকে যত জোরে টানবে, বিপরীতের কলকাতায় রাখা বস্তুখণ্ডের উপর তত টান পড়বে না।

কোন গোলকের কেন্দ্রে তার সম্পূর্ণ ভর সমর্পিত বলা হয়। অর্থাৎ, পৃথিবী আকারে যতবড়ই হোক, তার সমস্ত ভর জমে আছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে। এখন, চাঁদ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দুর দূরত্ব নিশ্চয়ই চাঁদ থেকে পৃথিবীর তুই পরস্পর বিপরীত পৃষ্ঠের তুটি দূরত্বের মাঝামাঝি হবে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দুর দূরত্ব ৩৮৪০০০ কিলোমিটার। চাঁদের দিকে ফেরানো পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের দূরত্ব $৩৮৪০০০ - \frac{১২৭৫৬}{২}$ কিলোমিটার এবং চাঁদের বিপরীত দিকে থাকা পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের দূরত্ব $৩৮৪০০০ + \frac{১২৭৫৬}{২}$ কিলোমিটার।

চাঁদের নিকটস্থ পৃথিবী-পৃষ্ঠে রাখা কোন বস্তুর উপর চাঁদের যা টান হবে, তা পৃথিবীর (যার ভর পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থিত) উপর চাঁদের টানের থেকে বেশি হবে। পৃথিবীকে জলবদ্ধ স্থান বলে অনুমান করলে, চাঁদের মুখোমুখি জল ঐ আকর্ষণের পার্থক্যের জন্য ফেঁপে উঠবে, এরই

নাম 'জোয়ার'। এখন প্রশ্ন হল, ঐ একই সময় পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠেও জোয়ার হয় কেন ?

কারণ, পৃথিবী (যার ভর পৃথিবী-কেন্দ্রে অবস্থিত) অপেক্ষা বিপরীত পৃষ্ঠে রাখা বস্তুর উপর চাঁদের টান কম হবে। বস্তুর উপর চন্দ্রমুখী টান যদি কেন্দ্রীভূত পৃথিবীর চন্দ্রমুখী টান থেকে কম হয়, তাহলে এদের দুজনের মধ্যে একটা সরণগত পার্থক্য দেখা দেবে, যেন কেন্দ্রীভূত পৃথিবী চাঁদের দিকে একটু বেশি সরে এলো। পৃথিবীর ও বিপরীত বস্তুর এই সরণ পার্থক্যের জন্য বস্তু উল্টোমুখে ঠেলে উঠবে। বস্তু যদি জল হয় তাহলে তা বিপরীত দিকের আকাশে ফেঁপে উঠবে—দেখা দেবে 'বিপরীতের জোয়ার'।

একই দিকে আকর্ষণ বোধ করছে এমন তিনটি বস্তুর উপর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ বল কিভাবে তাদের মধ্যে সরণগত পার্থক্য তৈরি করে, তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

ধরা যাক, তিন ব্যক্তি ক, খ, গ একটি স্থান থেকে একই দিকে ছুটছে। ক-এর গতিবেগ ঘণ্টায় দশ মাইল, খ-এর ঘণ্টায় পনেরো মাইল এবং গ-এর ঘণ্টায় বিশ মাইল। এক ঘণ্টা পর ক যাবে দশ মাইল, খ যাবে পনেরো মাইল এবং গ যাবে বিশ মাইল। ক এবং খ-এর মধ্যে পার্থক্য হবে পাঁচ মাইলের, খ ও গ-এর মধ্যে পার্থক্য হবে পাঁচ মাইলের। গতিবেগের পার্থক্যের জন্য এদের সরণ-পার্থক্য হল। বস্তুদের উপর আকর্ষণের পার্থক্য থাকলে, এইভাবে সরণ-পার্থক্য দেখা দেয়।

জোয়ার-ভাঁটার সময় এরকমই হয়। চন্দ্রমুখী পৃথিবী-পৃষ্ঠের বস্তু, পৃথিবী (যার ভরের অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে) ও চন্দ্র-বিপরীত পৃথিবী পৃষ্ঠের বস্তুর মধ্যে চাঁদের আকর্ষণের পার্থক্যের জন্য (যা আবার চাঁদের সঙ্গে দূরত্বের উপর নির্ভরশীল) পরস্পরের সরণ হবে। দুদিকে জল ঠেলে উঠবে, দু'দিকে জোয়ার হবে।

এই দু'দিকের জোয়ারের জল সরবরাহ করতে গিয়ে চন্দ্র ও পৃথিবীর

যুক্ত রেখার লম্ব-স্থানে অবস্থিত পৃথিবী-পৃষ্ঠের জলে টান পড়বে, ঐ দুই স্থানে ভাঁটা হবে। প্রায় বারো ঘণ্টা পর, পৃথিবী ঘুরছে বলে চন্দ্র-মুখীন পৃথিবী-পৃষ্ঠ বিপরীত দিকে চলে যাবে এবং বিপরীত-পৃষ্ঠ চাঁদের দিকে ঘুরে আসবে। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা পর আবার ঐ একই স্থানে জোয়ার হবে, একইভাবে বারো ঘণ্টা পর আবার ভাঁটা হবে। এইভাবে দিনে দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাঁটার উৎপত্তি হবে।

যদি আদপেই চাঁদ না থাকত? তাহলেও জোয়ার-ভাঁটা হত। সূর্যের টানে জোয়ার হত, ভাঁটা হত। তবে সে জোয়ার-ভাঁটায় জল তেমন ফুলতো না, ফুঁসতো না। সূর্য আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক বড় হলেও অনেক দূরে তার অবস্থান। দূরে থাকলেও পৃথিবীর উপর সূর্যের টান প্রবল, চাঁদের টানের চেয়েও বেশি। চাঁদের টানের চেয়ে সূর্যের টান প্রায় ১৮০ গুণ বেশি। তাহলে সূর্যের জন্য জোয়ার দুর্বল হবে কেন?

মূলকথা, পৃথিবীর দুই পৃষ্ঠে রাখা দুই বস্তুর উপর সূর্য বা চাঁদের আকর্ষণগত পার্থক্যের উপর জোয়ারের প্রাবল্য নির্ভর করে। পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বটি—পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় অনেক বড়। তাই সূর্য থেকে দূরত্ব হিসাব করলে পৃথিবীর দুই পৃষ্ঠদেশের দূরত্বের মধ্যে বাস্তবিক তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বা এই পার্থক্য এতই কম যে তাতে দুদিকের জলের উপর সূর্যের টানের পার্থক্য তেমন করে অনুভূত হবে না। তাই সূর্যের জন্য জোয়ার দুর্বল হয়। দুর্বল হলেও তা মাপযোগ্য। শুধু সূর্যের কারণেও পৃথিবীতে দু-বার জোয়ার ও দু-বার ভাঁটা হতে পারে। সূর্যের জোয়ারের টান, চাঁদের জোয়ারের টানের অর্ধেক হবে।

বায়ুমণ্ডলে কি জোয়ার-ভাঁটা আসে? হ্যাঁ, আসে। তবে তা খুবই দুর্বল। জলের তুলনায় বাতাস পাতলা, পৃথিবীর মোট জলের তুলনায় বাতাসের ভরও কম। তাই বাতাসের উপর চাঁদ, সূর্যের টান তেমন ভাবে অনুভূত হয় না। সমুদ্রের জোয়ার তীরভূমিতেই বোঝা যায়,

মাঝসমুদ্রে নয়। তীরদেশে, বালিতে, পাথরে, নদীর ব-দ্বীপে জোয়ারের ফাঁপানো জল আছড়ে পড়ে, আমরা জোয়ার-ভাঁটার খেলা বুঝতে পারি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের এক কোটি ভাগের একভাগ মাত্র চাঁদের জোয়ারের টান। কম টান হলেও তা সমগ্র জলরাশির উপর প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে, পৃথিবীর মোট জলরাশির ভর তো মোটেই কম নয়। কিন্তু চাঁদের এত অল্প টানকে অল্প জলের উপর বোঝা যায় না, তাই পুকুরের অল্প জলে জোয়ারের টান অনুভূত হয় না। একসঙ্গে অল্প শক্তিগুলি জড়ো হয়ে এত বড় শক্তি উৎপন্ন করে যে তার পক্ষে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করা সম্ভব। আজকাল এই জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করার চেষ্টা চলছে।

সত্যি, চাঁদ না থাকলে আমরা কত কিছু থেকেই না বঞ্চিত হতাম !

নিকোলাস কোপারনিকাস বনাম টাইকো ব্রাহে

কলকাতা শহরে এই কিছুদিন আগেও এক ভদ্রলোক কোপার-নিকাসের বিরোধিতা করে বেড়াতেন। শহরের দেয়ালে দেয়ালে লিখে, হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে তিনি প্রচার করতেন, 'পৃথিবী নয়, সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে'। ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল যে খবরের কাগজে তাকে নিয়ে লেখালেখি হয়। আমি তো একটা নাটকের হলে ভদ্রলোককে প্রোপাগাণ্ডা চালাতে দেখেছি। বহুরূপীর 'গ্যালিলিও' অভিনয় দেখতে গিয়েছি। দেখি – সেই ভদ্রলোক। তিনি শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কাছে প্রচারপত্র বিলোচ্ছেন।

ওনার ইস্তাহারটি আমি দেখেছি। অনেক ছবি, যুক্তি দিয়ে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঋতু-পরিবর্তন, দিনরাত্রি, গ্রহণ—এ সব ঘটনা তাঁর মতবাদ দিয়ে বোঝানো সম্ভব। অর্থাৎ, সূর্য যদি পৃথিবীর চারদিকে পাক দেয়, তাহলে ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, সমস্ত ব্যাপারটা জনসাধারণ বেশ একটা কৌতুক বলে নিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁর যুক্তি শুনে পড়ে বিজ্ঞানের ছাত্র-অধ্যাপকদের কাছে জানতে চেয়েছেন : সত্যিই তো, ভদ্রলোকের কথার যুক্তি আছে, তাহলে কি সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে না ?

আমি ওঁর সব যুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনায় যাব না। শুধু একটি বেছে নেব। আর তাতেই আমার বক্তব্য বিষয় বোঝানো যাবে। প্রথমে, ঋতু পরিবর্তনের কারণ হিসাবে উনি কি বলছেন দেখা যাক।

প্রাচীনকালে গ্রীসের গণিতবিদ ক্লডিয়াস টলেমি বিশ্বকে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব (geocentric universe) বলে প্রচার করতেন। এজন্য, মধ্যযুগ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, মহাবিশ্বে পৃথিবী কেন্দ্রে আছে, আর তাকে কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র আবর্তিত হচ্ছে। পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস এই

মতবাদকে খণ্ডন করে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের (heliocentric universe) মডেল চালু করেন। নিকোলাস কোপারনিকাসের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোক যে সৌর মডেল এঁকেছেন, তা এই রকম ঃ স্থির পৃথিবীকে সূর্য আবর্তন করছে, যেমন, পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করছে। একটি বিশেষ অবস্থানে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়, রাত ছোট —সমস্ত দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টা দিন এবং সূর্য ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশে অর্থাৎ মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট, রাত বড়। সমস্ত উত্তর মেরু অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টাই রাত্রি। উত্তর গোলার্ধে নিদারুণ শৈত্য। সূর্য ঘুরতে ঘুরতে ১৮০° উল্টোদিকে এলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে, উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম, দক্ষিণ গোলার্ধে শীত। সূর্য যখন আগের দুই অবস্থানের সঙ্গে লম্বভাবে আসবে তখন স্বভাবতই সূর্যের কিরণ পৃথিবীর বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে পড়ে, শীত গ্রীষ্ম দুই গোলার্ধে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে—দুয়ারে বসন্ত বা শরৎকাল এসে কড়া নাড়ে। তাহলে তো আমরা দেখছি, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন--সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে বলেই ঋতু পরিবর্তন সম্ভব।

এবার, নিকোলাস কোপারনিকাস কি বলেছেন দেখা যাক। কোপারনিকাসের মতে পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করছে। মহাকাশে সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবী তার চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। পৃথিবীর একটি বিশেষ অবস্থানে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। উত্তর মেরুতে এই সময় একাদিক্রমে ছ'মাসের দিন আর দক্ষিণ মেরুতে ছ'মাসের রাত। এরপর পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে বিপরীত দিকে (১৮০°) এলে ব্যাপারটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে, অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে আসবে শীত আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্ম। লম্ব অবস্থান শরৎ ও বসন্তকালকে চিহ্নিত করবে। এ সময় শীত ও গ্রীষ্ম মোটামুটি সমানভাবে উভয় গোলার্ধে ছড়িয়ে থাকবে।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল যে কোপারনিকাসের সৌরচিত্র দিয়েও ঋতু পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহলে তো প্রশ্ন ওঠে, কোন্ চিত্রটি সঠিক? পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করছে, না সূর্য পৃথিবীকে?

একথা ঠিক, যে কোপারনিকাসের বিপরীত মডেল দিয়ে গ্রহণ, দিনরাত্রি ইত্যাদি বহু ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব। আসলে, সমস্যাটার সমাধান করতে হলে আমাদের ইতিহাসের পাতা ধরে পিছোতে হবে। যেতে হবে সেই কোপারনিকাসের সময়ে। নিকোলাস কোপারনিকাসের তত্ত্ব কোন্ কোন্ বিরোধিতার সামনে পড়েছিল? এসব জানলে বোঝা যাবে—কে সত্য? কোপারনিকাস না আমাদের কলকাতার প্রচারক?

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে এই 'বিরোধী তত্ত্বটি' কোন ভাবেই নতুন নয়। এমন নয়, যে কলকাতার ভদ্রলোক প্রথম এই 'তত্ত্বটি' আবিষ্কার করেছেন। সেকালে, কোপারনিকাসের সৌরচিত্রটি যে শুধু ধর্মযাজকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল—তা নয়। তৎকালীন একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানীও কোপারনিকাসের বিরোধিতা করেছিলেন। সবচেয়ে মজার কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের দর্শনগুরু ফ্রান্সিস বেকন পর্যন্ত কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মডেলকে মানতে পারেন নি। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান সৌরজগত— স্থির সূর্য এবং অস্থির গ্রহরাজি—এ প্রত্যয় আনে না। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের অভাবের জন্য কোপারনিকাসকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ত্যাগ করেছিলেন বেকন। সে যুগে কোপারনিকাসের বিরোধী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডেনমার্কের টাইকো ব্রাহে। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টাইকো ব্রাহে কোপারনিকাস-বিরোধী একটি সৌরচিত্র বিজ্ঞানী মহলে পেশ করেন। টাইকো ব্রাহের মতে, মহাকাশে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটি নিকটবর্তী কক্ষপথে চাঁদ তাকে প্রদক্ষিণ করছে এবং একটি বাইরের কক্ষ দিয়ে সূর্য পৃথিবীকে আবর্তন করছে। অন্যান্য গ্রহগুলি আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

কোপারনিকাসের বিরোধিতার ব্যাপারে টাইকো ব্রাহে এবং ধর্মযাজকদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। টাইকো ব্রাহে খুব উঁচু জাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। ব্রাহের মানমন্দিরে অনেক ভাল ভাল যন্ত্রপাতি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সে যুগেই টাইকো ব্রাহে একটি সুপারনোভা আবিষ্কার করেছিলেন। টাইকো ব্রাহের কাগজপত্র, নোট অনুসরণ করে তাঁর ছাত্র জোহান কেপলার গ্রহ-উপগ্রহের পরিভ্রমণের সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন।

টাইকো ব্রাহের সৌরচিত্রের সঙ্গে টলেমির সৌরচিত্রের বিশেষ মিল নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রাহে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর তত্ত্ব ঠিক, কোপারনিকাস ভ্রান্ত। চোখের সামনে পরিভ্রমণরত সূর্যকে দেখেও বলতে হবে সূর্য স্থির—তা তিনি মানেন কি করে? সত্যি বলতে কি, কোপারনিকাস ও ব্রাহের তত্ত্ব যে আসলে একই, তা টাইকো ব্রাহে মোটেই বুঝতে পারেননি। মহাকাশের পটভূমিতে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরা বা পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের আবর্তন—দৃশ্যত একই। একে আমরা 'প্রতিফলিত প্রতিসাম্য' (reflective symmetry) বলি।

প্রতিফলিত প্রতিসাম্যের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ধরা যাক, দু'জন ব্যক্তি— একজন একটি চলন্ত ট্রেনে বসে আছেন, অন্য জন ট্রেনের লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। চলন্ত ট্রেনের ব্যক্তি দেখবেন যে লাইনের ধারে দাঁড়ানো ব্যক্তি ট্রেনের গতিমুখের বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছেন আর লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তি দেখবেন যে ট্রেনে বসা ব্যক্তি দ্রুতবেগে ট্রেনের গতিমুখে সরে যাচ্ছেন। দু'জনের সরণের মধ্যে ১৮০° কোণের পার্থক্য পাওয়া যাবে। একজনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যজনের সরণ হলে দু'জনেই একই রকম সরণ দৃশ্য দেখবেন।

অতএব, প্রতিফলিত প্রতিসাম্যের সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে কোপারনিকাস ও ব্রাহের তত্ত্বে আপাত পার্থক্য নেই। আর সেজন্য, ঋতু পরিবর্তন জাতীয় ঘটনাকে উভয় তত্ত্বের সাহায্যে বোঝানো যায়।

এ সব কথা বলার পরে যে প্রশ্ন থেকে যায়—তা হল, আসলে কোন্‌টি ঠিক? সত্যিই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে?

সত্যিই যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস ব্রাডলে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটি পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন। কোপারনিকাস আর টাইকো ব্রাহের আপাতবিরোধী তত্ত্বের সমাধানের জন্য গ্যালিলিও একটি উপযুক্ত পরীক্ষা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে-ছিলেন। সেই চেষ্টায় গ্যালিলিও বিফল হলেও শেষ পর্যন্ত জেমস ব্রাডলে কৃতকার্য হন। নক্ষত্রদের সঠিক অবস্থান জানার জন্য ব্রাডলে তাঁর পরীক্ষাটি করেছিলেন। ধরা যাক, একটা খুব লম্বা দূরবীণ দিয়ে একটি দূরের নক্ষত্র দেখা হচ্ছে। যদি দূরবীণের অভিলক্ষ্য (objective) দিয়ে নক্ষত্রের আলো প্রবেশ করে তাহলে সেই আলোকে দেখতে হলে সরাসরি আলোর রেখায় অভিনেত্রকে (eye piece) বসান দরকার। অভিলক্ষ্য দিয়ে আলোর প্রবেশ করার ইত্যবসরে পৃথিবী মহাকাশে স্থির না থেকে বিচরণ করার জন্য অভিনেত্র আলোর পথ থেকে কিছুটা সরে যাবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর যদি আবর্তন থাকে, তাহলে অভিনেত্র দিয়ে নক্ষত্র দেখতে হলে দূরবীণের অক্ষরেখাকে সামান্য বাঁকানো করতে হবে। ব্রাডলের আবিষ্কৃত এই ঘটনাকে 'অপেরণ' (aberration) বলা হয়। মহাকাশে পৃথিবী অচল অনড় না হয়ে ক্রমাগত ছুটে চলেছে বলে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নক্ষত্রদের অবস্থান ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ভাল বোঝা যাবে। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় কেউ যদি শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ছাতাটি মাথার উপর খাড়াভাবে ধরলে তার মাথায় জল পড়তে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে ছুটন্ত কোন ব্যক্তিকে জলের ছাঁট থেকে বাঁচতে সব সময় বাঁকাভাবে (যে দিকে ছুটছে সে দিকে হেলিয়ে) ছাতা ধরতে হয়। নক্ষত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর রশ্মি এসে পৃথিবীতে পড়ছে। আর পৃথিবী ছুটছে বলে, ঐ আলো দেখার জন্য আমাদের দূরবীণের অক্ষে বাঁকিয়ে ধরতে হয়। কিন্তু সূর্যকে আবর্তন করতে গিয়ে পৃথিবী প্রা দিক পরিবর্তন করছে। সেজন্য, বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর আব তলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত কোন একটি নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ ক দূরবীণকে বিভিন্নভাবে বাঁকিয়ে নিতে হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে ব্রাডলে আলোর গতিবেগও মাপতে পেরেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত জেমস ব্রাডলের 'অপেরণ' আবিষ্কার নিকোলাস কোপারনিকাসের গলায় বরমাল্য ঝুলিয়ে দেয়, টাইকো ব্রাহের ভ্রান্তি ধরা পড়ে। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়—এতো বড় সত্য আর দুটি নেই।
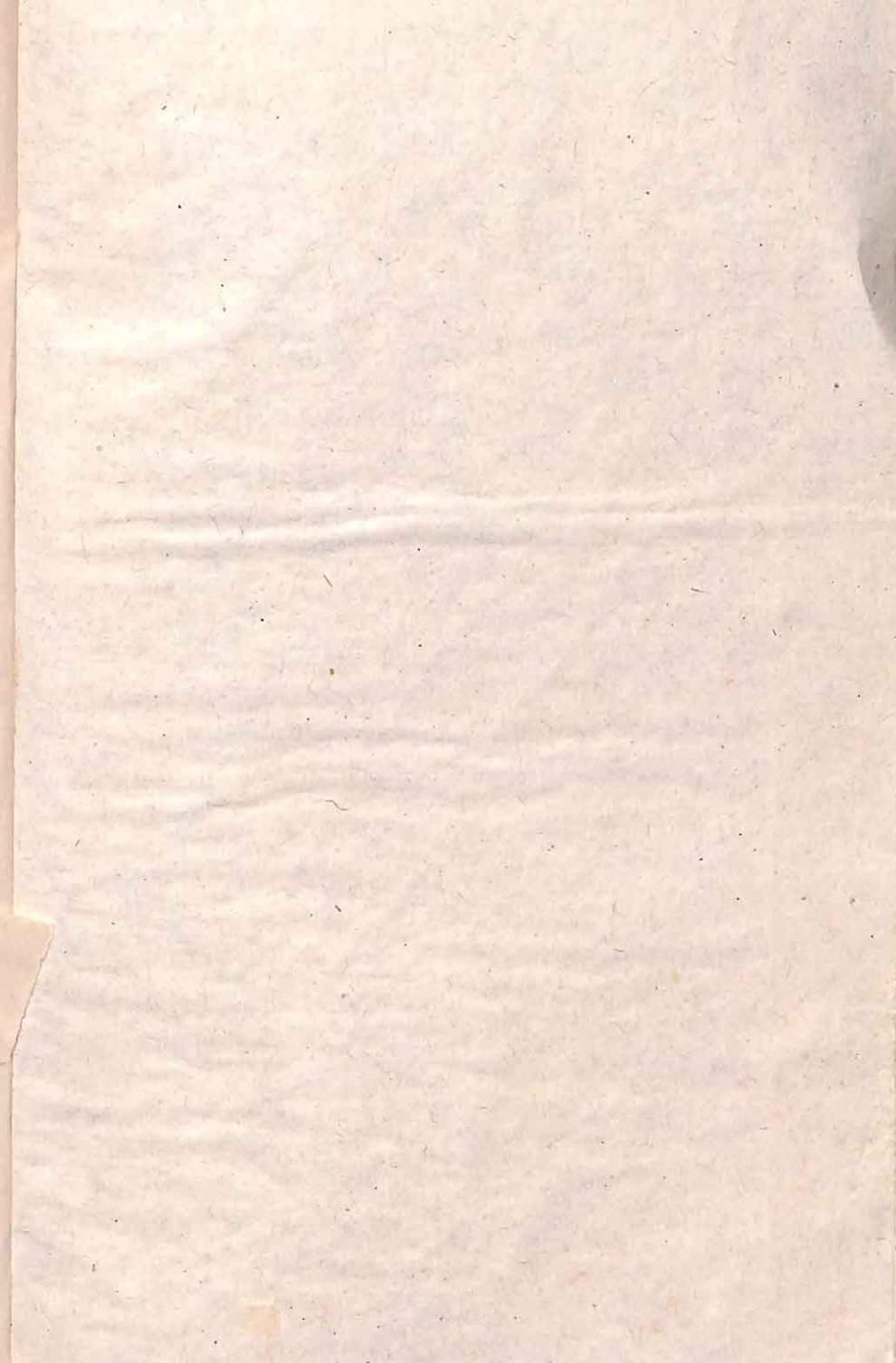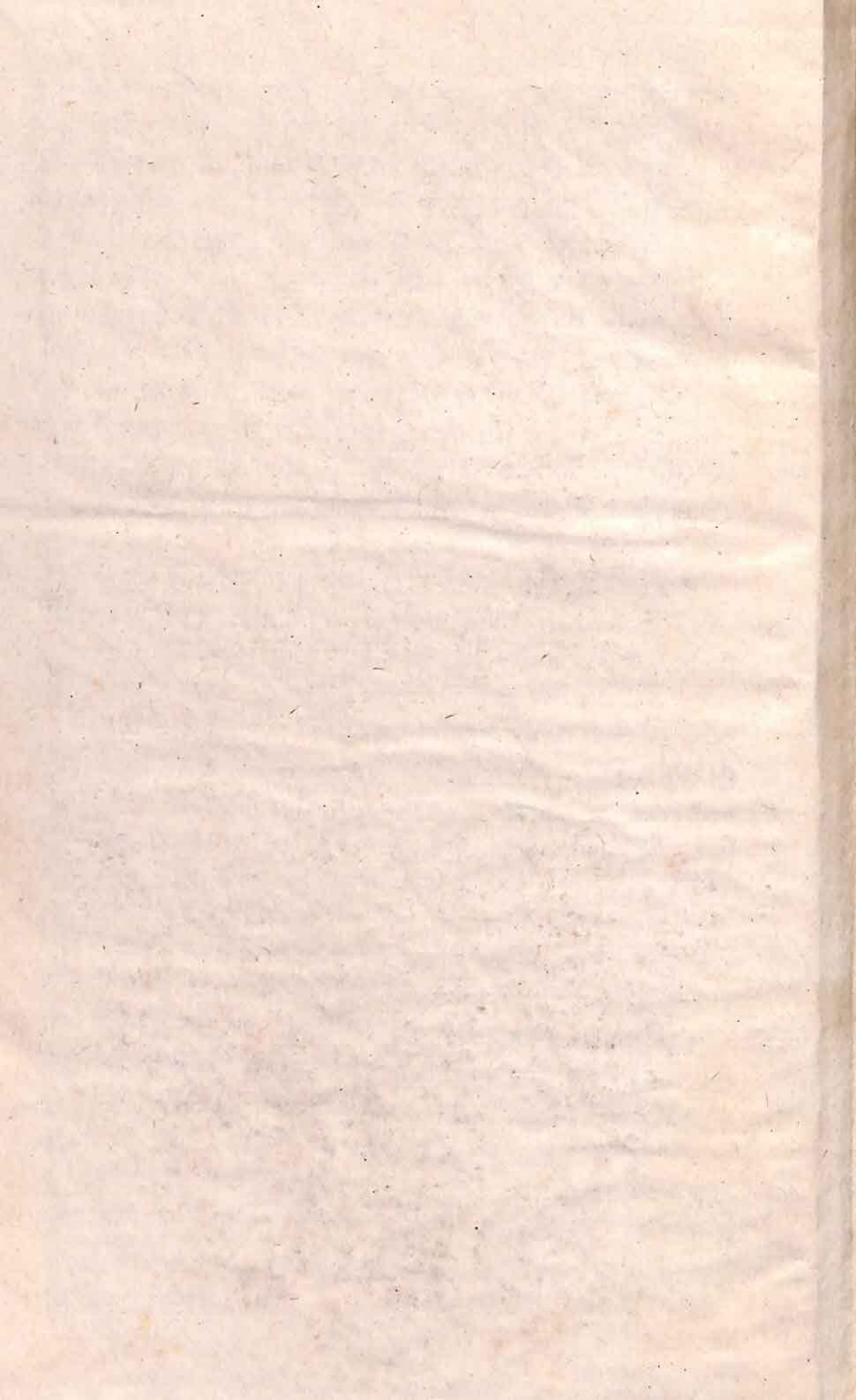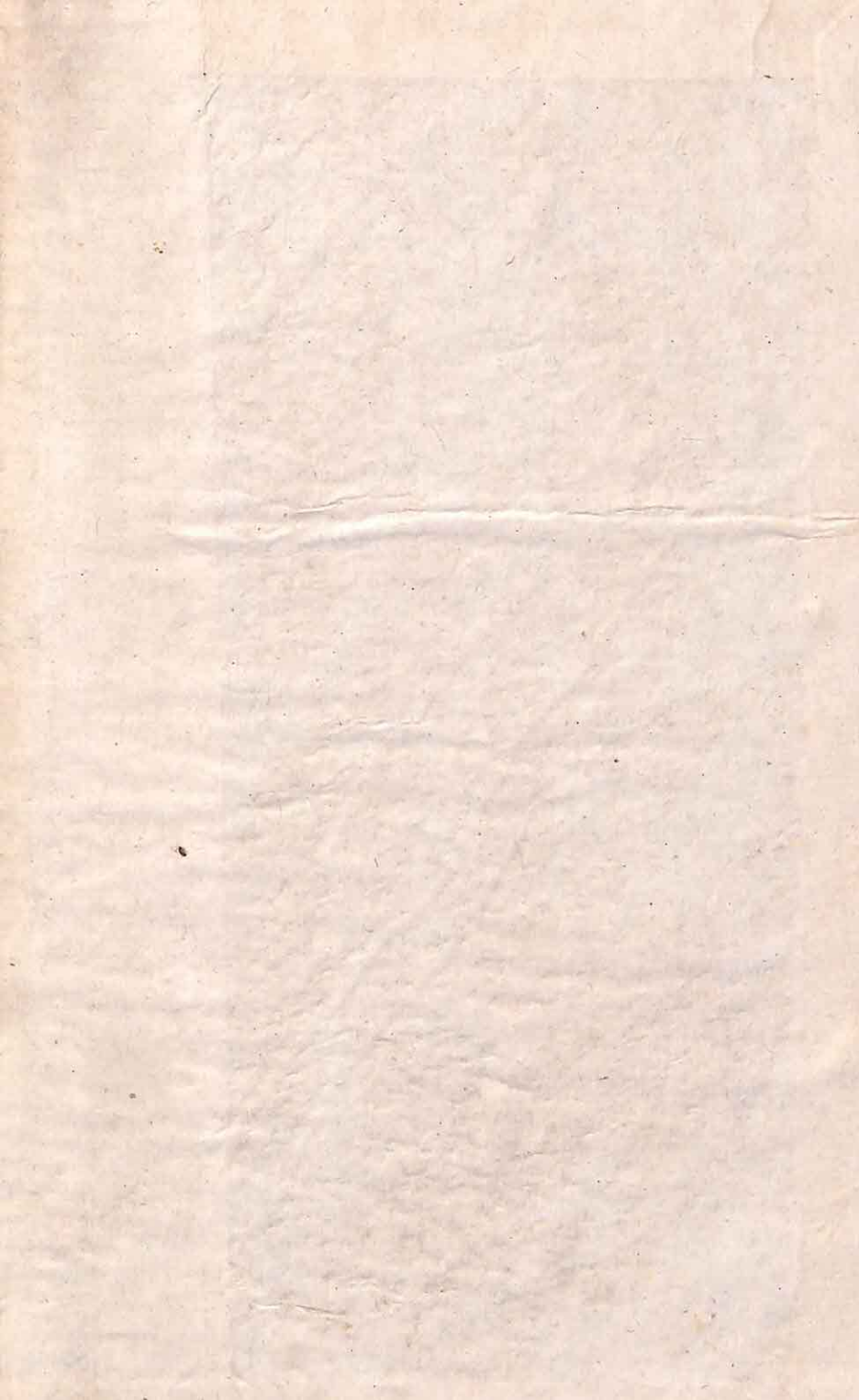
মহাকাশের ডাস্টবিন কোথায় ? কাকে বলে ভুতুড়ে গ্রহ ? নেমেসিসের উৎপাত কি ? এমন প্রশ্নের জবাব পেতে হলে এই বইটি পড়ুন। কৌতূহল জাগানো, মজায়ভরা এমন ত্রিশটি বিষয় নিয়ে 'স্বাগতম, হ্যালির ধূমকেতু' লেখা হয়েছে। লেখার ভাষা সহজ সরল, ভঙ্গী ঋজু। বিজ্ঞানকে অবহেলা করে বিজ্ঞানের বই লেখা বা দুর্বোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান লেখা—দুই-ই সযত্নে পরিহার করেছেন লেখক। একবার শুরু করলে কৌতূহলই আপনাকে পাতা থেকে পাতায় টেনে নিয়ে যাবে।

লেখক অপরাজিত বসু পেশায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ ডি। বিজ্ঞান-মনস্কতা আন্দোলন, জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালিখি ইত্যাদি তাঁর প্রিয় অভ্যাস। ইতিমধ্যেই অনেক নামী পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞান-প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'স্বাগতম, হ্যালির ধূমকেতু' লেখকের প্রথম জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের বই। 'আবহাওয়া ও আমরা' শিরোনামে লেখকের আর একটি বিজ্ঞান পুস্তক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে শীঘ্র প্রকাশিত হতে চলেছে।